দ্বিতীয় অধ্যায়

'শনিবারের চিঠি'র পরিচয় পৃঃ- ৪৩-৭৬

ক. পরিচিতি : মুখবন্ধ পৃঃ- ৪৩
খ. উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য পৃঃ- ৫২
গ. উদ্ভব ও পর্যায় পৃঃ- ৫৮
ঘ. আড্ডা ও লেখক পৃঃ- ৬৭
প্রসঙ্গ সূত্র পৃঃ- ৭৪

ক. পরিচিতি : মুখবন্ধ

বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যে এক সময়ে 'শনিবারের চিঠি' প্রচণ্ড বিতর্ক, তীব্র কোলাহল ও প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । বিশ শতকের তৃতীয় দশকের গোড়া থেকেই দেশের রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য, অর্থাৎ, সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অধুনা বিস্মৃত-প্রায় এই ছোট পত্রিকাটির সতর্ক দৃষ্টি পড়েছিল, এবং বলিষ্ঠ সমালোচনা, কঠোর আক্রমণ ও তীব্র অভিযান শুরু করে সমগ্র দেশে একটা 'আতঙ্ক ও বিস্ময়' সৃষ্টি করেছিল । এই পত্রিকাটির কার্যক্রম যেমন সে সময়ে কিছু লোকের প্রশংসা ও উৎসাহ পেয়েছিল, তেমনি কেউ কেউ এটিকে ত্রাস বা ঘৃণার সামগ্রী মনে করে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন, প্রত্যাঘাতে এর কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছেন । কেউ কেউ মনে করতেন এটি সমাজ-শিক্ষা ও সমাজের স্বাস্থ্য-রক্ষার এক নির্ভরযোগ্য বলিষ্ঠ হাতিয়ার, কারো কাছে এটি নিতান্ত কিছু লেখক-যশপ্রার্থীর ব্যক্তিগত কুৎসার ও অশ্লীলতার 'হলদে কাগজ' ছাড়া আর কিছু মনে হত না । অথচ রবীন্দ্রনাথ সহ অনেক মনীষী, চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সমাজ-দরদী এই পত্রিকাটির 'বাড়াবাড়িকে সমালোচনা করেও এর উদ্দেশ্য, শক্তি ও সাধনাকে স্বীকৃতি ও স্বাগত জানিয়েছেন ।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় 'কল্লোল'-'কালি-কলম'-'প্রগতি' পত্রিকা যেমন 'যুগান্তর' সৃষ্টির প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়েছিল, সাহিত্যের পালাবদলের কাজে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, 'শনিবারের চিঠি'ও সেই একই পরিপ্রেক্ষিতে সমরূপ ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ ও পালন করেছে । পত্রিকাটির তথাকথিত 'প্রগতি বিরোধিতাকে সংস্কারহীন চোখে আদ্যন্ত বিচার করা দরকার । মনে রাখা দরকার — ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, অগ্রসরতা ও বাধা, স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি — এদের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে সমগ্রতার ও সত্যের পরিচয় । ভুলে গেলে চলে না — 'কল্লোল'-'কালি কলম'-'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকা যেমন ছিল তরুণদের মুখপত্র, 'শনিবারের চিঠি'তেও তেমনি আশ্রয় নিয়েছিলেন অনেক প্রতিভাবান তরুণ, এবং সেই সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব । সমাজের যন্ত্রণা তাঁদের চিত্তেও প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছে, তাঁরাও অগ্রগতিকে স্বীকার করেছেন । আঘাতের মুহূর্তে 'শনিবারের চিঠি' যতই বিরক্তি উৎপাদন করে থাকুক না কেন, সময়ের ব্যবধানে আজ তার বক্তব্যে, বিশ্লেষণে ও মানসিকতায় কিন্তু বিচারযোগ্য ইতিবাচক সত্তা ধরা পড়ে, যেমন ধরা পড়ে 'কল্লোল' প্রভৃতির প্রবল স্রোতের জলে

'অনেক জঞ্জাল' আমাদের সাহিত্যে ও জীবনে অনেক বিকার সৃষ্টি করেছিল । প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সমাজ ও সাহিত্যকে চিনতে গেলে এই সমস্ত পত্রিকারই বিচার প্রয়োজন,—'রক্ষণশীল' বা কুৎসা-প্রচারমাত্র বলে কাউকেই অস্বীকার করা চলে না । কিন্তু প্রচারের জোরে আজ তথাকথিত প্রগতিবাদী পত্রিকাগুলি সমালোচক ও ঐতিহাসিকের কাছে যেমন স্বীকৃতি লাভ করছে, 'শনিবারের চিঠি' বিভিন্ন কারণে তেমনি থাকছে উপেক্ষিত, নিন্দিত । তাই বর্তমান আলোচনায় এই পত্রিকাটির বিশদ পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় পত্রিকাটির ভূমিকা পর্যালোচনা করে সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে তার অবদান নির্দেশ করতে চাওয়া হয়েছে, — ঐতিহাসিক কারণে ও কর্তব্যবোধে ।

আলোচনার শুরুতে এই পত্রিকাগুলি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের মতামত স্মরণ করা যাক্ । এই মতামতের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক সমাজ ও সাহিত্য, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা সৃষ্টির কাজে এই পত্রিকাগুলির গুরুত্ব ও ভূমিকা আভাসিত হবে ।

আধুনিক বাংলাদেশের ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার অবশ্য এই সকল 'ছোটখাট পত্রিকা র ওপর তেমন গুরুত্ব দিতে চান নি । তাঁর মতে —" এই সময়ে (বিশ শতকের তৃতীয় দশকের গোড়ায়) দুইখানি পত্রিকা বিভিন্ন কারণে কিছুকালের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 'শনিবারের চিঠি' নিন্দামূলক সমালোচনার জন্য বিখ্যাত বা কুখ্যাত ছিল । .... দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'কল্লোল' ও প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কালিকলম' তথাকথিত আধুনিক যুগের ছোটখাট লেখক সম্প্রদায়ের দুইটি মুখপত্র ছিল । 'শনিবারের চিঠি'র ন্যায় ইহাও কাল-সমুদ্রে বিলীন হইয়াছে, কোন বিশেষ চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই ।" [১]

অপর দিকে ডঃ সুকুমার সেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 'ভিত্তিপত্তনে' এই 'ছোটখাট' পত্রিকাগুলির গুরুত্ব অসাধারণ বলে বিশ্বাস করেন । বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন —"তৃতীয় দশক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ('কল্লোল'-গোষ্ঠী) প্রায় আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পত্তন করিয়াছিলেন ।"[২] 'কল্লোলে — কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি' শিরোনামা দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা-পর্বে এই ধরণের পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা, সংঘর্ষ এবং সদর্থক ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন ।[৩]

ডঃ সেন অবশ্য 'কল্লোল' — গোষ্ঠীভুক্ত পত্রিকাগুলিকেই 'যুগান্তরের বার্তাবহ' বলে

সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছেন ।'শনিবারের চিঠি'তে 'সৃষ্টির কাজ অল্প-স্বল্প' হলেও এই পত্রিকাটির ভূমিকাকে তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চান নি । 'শনিবারের চিঠি'র' কালিমাই হয়ত তাঁর এরূপ ঔদাসীন্যের কারণ । ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঐতিহাসিকেরাও 'শনিবারের চিঠি'কে 'সনাতন পন্থী', 'আধুনিকতা-বিরোধী', 'বিতন্ডামূলক' পত্রিকা বলেই উপেক্ষা করে গেছেন । অর্থাৎ ঐতিহাসিকের কাছে 'শনিবারের চিঠি'র সদর্থক ভূমিকার কোন স্বীকৃতিই নেই ।

সমালোচক মহলে কিন্তু এই পত্রিকাটি মিশ্র-ধারণা সৃষ্টি করেছে । কেউ কেউ এটিকে তেমন গুরুত্ব দিতে না চাইলেও অধিকাংশের কাছে এই পত্রিকাটি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা খুবই উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হয়েছে ।

বর্তমানে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীভুক্ত পত্রিকা সমূহ এবং 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে আলোচক মহলে যে মূল্যায়ণ ও সংস্কার গড়ে উঠেছে, তা মূলতঃ 'কল্লোল-গোষ্ঠীর' বিপুকর্মীদের রচনার ধারা থেকেই উৎসারিত ও অনুপ্রেরিত । অন্য ধারার মতামত নানা কারণে প্রচারের সুযোগ পায় নি । অথচ এই ধরণের পত্রিকাগুলির প্রকৃত ভূমিকাকে জানতে গেলে সকল শ্রেণীর মতামতকেই সংস্কারহীন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিচার করা দরকার ।

সেই বিশেষ যুগটির এবং সেই বিবদমান পত্রিকাগুলির পরিচয়ের পক্ষে শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ' নিঃসন্দেহে একটি প্রথম আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রাহ্য । অবশ্য 'কল্লোলে'র অন্যতম 'ভগীরথ' স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর ভাবাবেগ ও বিচার বিশ্লেষণকে সংযত রাখতে পারেন নি । তাঁর বিশ্বাস ছিল — 'কল্লোল'সকলের,' সকল 'তরুণের', বাংলা সাহিত্যে 'আধুনিকদের' একমাত্র মুখপত্র'— যা পরে নানা শাখায় পল্লবিত হয়েছে ।[৩] "তার পথ ছিল স্বকীয়তার, সাধনা ছিল নবীনতার, অনন্যতার । ... যে যৌবন-দীপ্তিতে বাংলা সাহিত্য একদিন আলোকিত হয়েছিল তার লয়-ক্ষয়-ব্যয় নেই, সত্যের মত তা সর্বাবস্থায়ই সত্য থাকবে ।" পক্ষান্তরে — 'শনিবারের চিঠি' "কোন বিশেষ পাড়া থেকে বের হয়ে" 'প্রবাসীর ভূত' এই 'পন্টনের দল' কেবল কুৎসা গেয়েছে, নোংরা ঘেঁটেছে, অথচ ভাণ করেছে 'সে যুগের সুরেশ সমাজ-পতির । শেষের দিকে অবশ্য অচিন্ত্যবাবু যখন শত্রুতার রুদ্ধশ্বাস শিবির থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন, তখন লক্ষ্য করেছেন — "শনিবারের চিঠিও ক্রমে ক্রমে রোষের জগৎ থেকে চলে আসতে লাগল রসের জগতে[৪] ।"

এই প্রসঙ্গেই স্মরণে আসে 'কল্লোলের আর এক 'বিশ্বকর্মা' শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য । সজনীকান্ত দাসের বিয়োগ-মুহূর্তে তিনি শুধু অচিন্ত্যবাবুরই আন্তরিক পরিবর্তিত মনোভাবকে প্রকাশ করেন নি, নিজেও স্মরণ করেছেন —"নিতান্ত খেয়ালের বশে কয়েকজন বন্ধুর একটি জমজমাট আড্ডা থেকে অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং যোগানন্দ দাসের সম্পাদনায় বেরুলো ছোট একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা । পত্রিকা না বলে তাকে চিঠি বললেই ভালো হয় । ... বাংলা সাহিত্যের একজন নির্মম নিষ্ঠুর এবং কঠোর সমালোচক বলে যে অখ্যাতি তার (সজনীকান্ত) রটেছিলো, সেটাকে সে তার অঙ্গের ভূষণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিলো 'শনিবারের চিঠি'র জাত বাঁচাবার জন্যে । ... সেইটেই কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'র আসল রূপ নয় । ব্যঙ্গ কৌতুকের একটি ছোট পত্রিকাকে কোন যাদুমন্ত্র-বলে সজনীকান্ত বাংলার একটি সর্বজন-সমাদৃত অনন্যসাধারণ সাহিত্য পত্রিকার মর্যাদা দান করেছিল ।"[৫]

এমন কি 'কল্লোল' - স্রষ্টা শ্রী বুদ্ধদেব বসুও স্বীকার না করে পারেন নি —' "শনিবারের চিঠি আর যাই হোক 'সিনসিয়ার' – ওরা যা বলে তা ওরা নিজেরা বিশ্বাস করে ।"[৬] বুদ্ধদেববাবু অবশ্য 'শনিবারের চিঠি'র কোন ইতিবাচক ভূমিকাকেই স্বীকার করেন নি । পত্রিকাটি তাঁর কাছে বরাবরই অপাংক্তেয় থেকে গেছে । তিনি আদ্যন্ত 'কল্লোলীয়;' — 'কল্লোল'ই তাঁর কাছে— "পরিবর্তনের ধাত্রী এবং আধার' । 'যে সব অখ্যাত কিম্বা কুখ্যাত এবং সন্দেহভাজন যুবক সেই সময়ে বলার জন্য আকুলি- বিকুলি করছিলো, যাদের আক্ষরিক অর্থে কন্ঠরোধ করারও প্রস্তাব উঠেছিলো, তাদের পথ হতে দেবার মতো, উত্তাপটুকু 'কল্লোল' ছাড়া সারা দেশে আর কোথাও ছিলো না ।"[৭]

শুধু 'কল্লোলীয়রাই নয়, ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায়ের মত বিদগ্ধ সমালোচকও 'কল্লোল-গোষ্ঠীর মতবাদকেই সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন । তাঁর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ 'কল্লোলের কাল'-এ তিনি 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর পত্রিকাগুলির ভূমিকা অসামান্য বিশ্লেষণে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু বিরুদ্ধ পত্রিকা-গোষ্ঠীর প্রতি ঐতিহাসিক নিরাসক্তি ও সুবিচার দেখাতে পারেন নি । 'কলোলের কাল' তাঁর মতে 'বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের কাল' । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া, তথা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সান্নিধ্যে বিশ্বতোমুখী দৃষ্টি, রুশ বিপ্লব ও ফ্রয়েডীয় চর্চা এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে তরুণ মধ্যবিত্তের বিষাদ-চেতনা, যৌবন-সংলগ্নতা প্রভৃতি — এই গোষ্ঠীর সাহিত্যে সুনির্দিষ্টভাবে যে মোড় ফেরার চিহ্ন ফুটিয়েছে, গবেষক বিস্তারিত বিশ্লেষণে তা দেখিয়েছেন । কিন্তু একই সময়কালে

প্রকাশিত 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে তিনি কোন বিচারই করতে চান নি । সেটিকে 'প্রাচীনপন্থী' 'রক্ষণশীল'দের পত্রিকা বলেই নিরস্ত থেকেছেন । শুধু তাই নয়, — তিনি রায় দিয়েছেন — "শনিবারের চিঠির কোনো আদর্শ ছিলো না । সাহিত্যের শুচিতা রক্ষার নামে সাহিত্যিকদের বিশেষ করে তরুণদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের বাণ নিক্ষেপ করাই এর লক্ষ্য ছিলো" । ৮

আর এক গবেষকও 'কল্লোল-চেতনার স্বরূপ নির্দেশ করে মন্তব্য করেছেন —"কল্লোল এক স্বকীয় ধারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল । কল্লোল-গোষ্ঠির বিশিষ্ট লেখকদের রচনায় জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অভিনব কিছু বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস ছিল ।" ৯ তিনিও কিন্তু এ যুগের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'র মনোভাবকে স্মরণ করেন নি । অবশ্য 'কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের 'যৌবনরাগ', 'জটিল জীবন সমস্যা' প্রভৃতির পর্যালোচনার পর 'শনিবারের চিঠি'র আশ্রয়ে লেখা কথা সাহিত্যে 'সহজ জীবন প্রত্যয়', 'হাস্যরসাশ্রিত জীবন-বীক্ষা', 'পরীক্ষা-প্রবন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি' প্রভৃতিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি । কিন্তু উক্ত গ্রন্থের কোথাও 'শনিবারের চিঠি'র কোন স্বীকৃতি, এমন কি উল্লেখমাত্র নেই, —শুধু সেগুলিকে 'কল্লোলোত্তর' বলে অভিহিত করেছেন । সাধারণভাবে আলোচনা-গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-গুলির মূল দৃষ্টিভঙ্গি এই রকমেরই ।

'শনিবারের চিঠি'র সদর্থক ভূমিকাকে বিশদভাবে সমর্থন ও বিশ্লেষণ করেছেন কেবল 'শনিমণ্ডলের' অন্তরঙ্গ ও অনুরাগীবৃন্দ । তাঁদের বক্তব্যও নানা কারণে জনসমক্ষে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা পায় নি । অথচ এই লেখকদের ব্যক্তিত্বে ও বক্তব্যে চিন্তা করার উপাদান যথেষ্ট আছে। তবু অন্য সাক্ষ্য দেখা যাক ।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গোড়ার দিকে 'শনিমণ্ডলভুক্ত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্যে তিনি 'সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ' । 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে তাঁর মতামত ঠিক অন্তরঙ্গের মত নয়, প্রকৃত সমালোচকের । তিনি বলেছেন —"সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠার আর আধুনিকতার নামে তখন বাংলাদেশে যে পঙ্কিলতা আর নীতিবোধের অভাব দেখা দিচ্ছিল, আর সংক্রামক ব্যাধির মত যা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, তা দেখে আমি আরও পাঁচ জনের মত অস্বস্তিবোধ করছিলুম । ... আমাদের মনের কথা 'শনিবারের চিঠি'র মাধ্যমেই যেন ভাষা পেল । .. বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সচ্চিন্তা আর সুগুণের পরিপোষণের জন্যে কতটা না জ্ঞান আর রসবোধ নিয়ে মাতৃভাষার সার্থক সেবা চলেছিল ।" ১০

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরও সুনীতিবাবুর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হয়ে মন্তব্য করেছেন— "আজকের দিনে যাঁরা বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁদের অনেকেই সেদিন সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত । তারুণ্যের চাঞ্চল্য ও ঔদ্ধত্য তাঁদের রচনায় অনেক সময় প্রকাশ পেত । ইউরোপীয় সাহিত্যের দীপ্তিতে তাঁদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল বলে আমাদের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্নিগ্ধ আলোক সব সময় তাঁদের চোখে পড়ত না । 'শনিবারের চিঠি' সেদিনকার আধুনিকতাকে যেভাবে রোধ করতে চেয়েছিল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা স্মরণীয় । কোন কোন ক্ষেত্রে 'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনা আক্রমণে রূপান্তরিত হত, কিন্তু সাহিত্যের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য হয়তো সে তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের প্রয়োজনও ছিল ।"[১১]

অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন — "শনিবারের চিঠিকে কেন্দ্র করে সাহিত্যক্ষেত্রে বহুবার তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে । যেমন একদিকে সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে বাদানুবাদ মূলক আলোচনা উক্ত পত্রিকাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল, তেমনি অন্যদিকে নূতন লেখকের বলিষ্ঠ সম্ভাবনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল । ... তার সঙ্গে একটা যুগের অবসান হয়েছে ।"[১২]

সাহিত্যিক মহলেও 'শনিবারের চিঠি'র সদর্থক ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে । শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন --"সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পাদক ও সমালোচক যোদ্ধা সজনীকান্ত তাঁর প্রখর শরাঘাতে শুধু ভাঙার কাজই করেন নি, তিনি গড়েছেন । তাঁর সে সংগঠন অনেক সম্ভাবনা এনেছে বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে ।"[১৩]

শ্রী প্রবোধকুমার সান্যালের লেখায় —"তখন বাংলার সাহিত্যে এলো নতুন তরঙ্গ । এরা কেউ মার্কামারা জাতীয়তাবাদী নয় । রাজনীতির সঙ্গে এদের যোগ নেই । এরা সাহিত্যে রাজনীতি আনতে চায় না । এরা জীবনরসিক এবং সাহিত্যরসপ্রিয় । এদেরই অভিভাবক হয়ে যাঁরা সামনে এগিয়ে এলেন, তাঁদের মধ্যে দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় । এরাই একটি মাসিকপত্র বের করেন --'কল্লোল' । ... ওদের লেখাগুলো হত কাঁচা, কিন্তু আপন প্রচণ্ডতায় নতুন । ... ওরা অশ্লীল লেখা ঠিক লেখে না, লেখে তার চেয়েও যা মারাত্মক — অর্থাৎ দুর্নীতিবাদ । ওরা ভাঙতে চাইছিল রক্ষণশীলতাকে, চলতি সমাজকে ওরা জাহান্নমে পাঠাচ্ছিল, ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে তছনছ করে দিচ্ছিল । ... ওরা চাচ্ছিল এমন একটা জীবন— যার স্পষ্ট ছবি ওদের নিজেদের কাছেও নেই । .... তৎকালীন 'শনিবারের চিঠি'র চেষ্টা ছিল 'কল্লোল' - 'কালিকলম'- 'প্রগতি' 'ধূপছায়া'র অতি-

আধুনিক লেখক-গোষ্ঠির কেউ যেন ভদ্র সমাজে জায়গা না পায় ।"[১৪]

শ্রী কালিদাস রায় শোনালেন —"শনিবারের চিঠি এলেই তার 'সংবাদ-সাহিত্য' আগেই পড়ে নিই । এমন চিত্তাকর্ষক বস্তু সচরাচর মাসিক পত্রে আর পাই না । 'সংবাদ সাহিত্যে' সজনীকান্তের বৈদগ্ধ্য, চিন্তাশীলতা, অধ্যয়নশীলতা, তথ্য সংগ্রহে পটুতা ও বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ।"[১৫]

কবি কুমুদ রঞ্জন স্বীকার করলেন — 'কত শিবেতর করিয়াছ নাশ । ফুটায়েছ ফুল, ফুটায়েছ হুল । কত দর্পীর ছোটায়েছ ভুল । কত প্রতিভার করেছ বিকাশ । গড়িয়াছ শুচি শনিমণ্ডল ।"[১৬]

শ্রী সুশীল রায় আরও স্পষ্ট করে বললেন — শনিবারের চিঠি" প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতার বিরোধী ছিল না, আধুনিকতার ছদ্মবেশে উচ্ছৃঙ্খলতারই ছিল বিরোধী ।"[১৭]

শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তো ভাবালুতার আতিশয্যে মন্তব্য করলেন —"বঙ্গদর্শন অনেক দূরে পড়ে গেছে এখন । সাম্প্রতিক কালে, অর্থাৎ আমাদের সময়ের এমন মাসিক পত্রের যদি নাম করতে হয়, যেগুলি স্বকীয়তায় অনন্যসাধারণ, তো একসঙ্গে তিনটির নাম করতে হয় — 'প্রবাসী,' 'সবুজপত্র,' আর 'শনিবারের চিঠি' । তিনটি সৃষ্টিই তাদের স্রষ্টাদের সঙ্গে একাত্ম, তাঁদের ব্যক্তিত্বের আলেখ্য ।"[১৮]

এ রকম আরও অজস্র প্রবীণ-নবীন সাহিত্যিকের সাক্ষ্য বহন করে আছে 'শনিবারের চিঠি'র 'সজনীকান্ত স্মরণ সংখ্যা'— (ফাল্গুন, ১৩৬৮) । এঁরা উল্লেখ করেছেন কি উদার অনুপ্রেরণায়, আন্তরিক আনুকূল্যে 'শনিবারের চিঠি' নতুন প্রতিভার বিকাশে আগ্রহ ও প্রযত্ন দেখিয়েছে । 'শনিবারের চিঠি' প্রকৃত পক্ষেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অকৃত্রিম ও একান্ত কেন্দ্র হয়ে দেখা দিয়েছিল — অন্ততঃ কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে । আর রবীন্দ্রনাথের কথা তো অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর 'রচনাবলী'তে, বিশেষ করে 'সাহিত্য সমালোচনা' শীর্ষক আলোচনায় ।[১৯]

'শনিবারের চিঠি' ও 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর পত্রিকা সমূহের পারস্পরিক তুলনা বা নিন্দা-প্রশংসা এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয় । এমন কি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সেবায় কোন্ পত্রিকার গুরুত্ব কতটা — তাও আমরা এখানে নির্দেশ করতে চাই না । আমরা যে কথাটা স্পষ্ট করে বলতে চাই, তা হল — বিশ শতকের যুদ্ধোত্তর কালের বাংলা সাহিত্যে যে

পালা বদলের চিহ্ন ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছিল, বাংলা সাহিত্যে যে 'আধুনিকতা' প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করেছিল, তাতে কেবল 'কল্লোল' — গোষ্ঠির পত্রিকা সমূহেরই একান্ত অবদান ছিল না, 'শনিবারের চিঠি'রও নিশ্চিত ও সদর্থক ভূমিকা সেখানে ছিল । 'শনিবারের চিঠি'ও ছিল যুগেরই ফসল, তরুণদের মুখপত্র, আধুনিকতার ধাত্রী । কিন্তু 'কল্লোল'— গোষ্ঠীর লেখকেরা পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করায় 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে তাঁদের ধারণাটাই আজ সাধারণ্যে প্রচারিত ও স্বীকৃত হয়েছে । এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য সেই সাধারণ ধারণার নিরসন ঘটানো, তথা— নিরপেক্ষ ও বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণে 'শনিবারের চিঠি'র প্রকৃত ভূমিকার পর্যালোচনা ও পুনর্মূল্যায়ণ । শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্যের সুরে সুর মিলিয়ে আমরা এখানে স্পষ্ট করে দেখাতে চাই — ''শুধু 'অস্তি' নয়, শুধু 'নাস্তি'ও নয়, —'উভয়'কে নিয়েই জীবনের অগ্রগতি । তাই 'কল্লোল' — 'কালিকলম' - 'প্রগতি'র অনিবার্য পরিপূরক হল—'শনিবারের চিঠি' । খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখলে এরা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, কিন্ত 'অস্তি' ও 'নাস্তি'কে 'উভয়ে' মিলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে এরা পরস্পর পরস্পরের শুধু পরিপূরকই নয়, পরস্পরের পক্ষে অত্যাবশ্যকও বটে ।''[১০]

ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় 'কল্লোলের কাল' বিচার করার সময় মন্তব্য করেছিলেন — ''কল্লোলের জন্মের পর পঞ্চাশ বছর পার হোতে চললো । আজ আমরা কল্লোলের কাল থেকে ঐতিহাসিক দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছি । পত্রিকাটির ভালো মন্দ ও তার সাহিত্যিক ভূমিকা সম্পর্কে এখন নিরপেক্ষভাবে বিচার করবার সময় এসেছে ।''[১১] মন্তব্যটি একজন প্রকৃত ঐতিহাসিকের । 'শনিবারের চিঠি'র পুনর্মূল্যায়ণ করার সময় আমরাও এই সত্যকে মনে রাখতে চাই । এবং সেই সঙ্গে এও বিশ্বাস করি — যে কোনও পত্রিকার বিচার করার সময় তার সহায়ক বা সমর্থক পত্রিকার কথা যেমন গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করতে হয়, বিরোধী গোষ্ঠীর বক্তব্য ও ভূমিকাকেও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা প্রয়োজন । বিশেষ করে সে যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতটিকে জানতে গেলে 'শনিবারের চিঠি' কেন ও কিভাবে আধুনিকতার জয়যাত্রাকে ঠেকাতে চেয়েছিল, তার সম্যক্ বিচার পরিপূর্ণ সত্যের পক্ষেই অত্যাবশ্যক । তাতে 'শনিবারের চিঠি' এবং 'কল্লোল'— গোষ্ঠীর পত্রিকা সমূহ — সকলেরই যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হবে ।

'কল্লোল' — গোষ্ঠীর পত্রিকা সমূহের পরিচয় ও অবদান আজ সর্বজন বিদিত ও সমর্থিত । কিন্তু প্রায় সর্বক্ষেত্রেই উপেক্ষিত ও নিন্দিত হয়েছে 'শনিবারের চিঠি' । বাংলা

সমালোচনা সাহিত্যে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতেও সে যুগের বহু-বিতর্কিত দীর্ঘায়ু ''কোলাহল'-মুখর' এই পত্রিকাটির কোন সদর্থক ভূমিকার তেমন উল্লেখ দেখা যায় না, বরং প্রায় ক্ষেত্রেই এই পত্রিকাটির ভূমিকাকে বিকৃত ও নঞর্থক রূপে দেখানোর প্রয়াস চোখে পড়ে। তাই আমরা বর্তমান আলোচনায় 'শনিবারের চিঠি'র বিস্তারিত ইতিহাস পর্যালোচনা করতে চেয়েছি। বাংলা সাহিত্যে 'আধুনিকতা' সম্পর্কে পত্রিকাটির মতামত কি ছিল, কেন সে সেই সময়ে তরুণ সাহিত্যিকদের বিরোধিতায় এমন উগ্রভাবে অভিযান চালিয়েছিল, তাদের বক্তব্যে ও প্রকাশভঙ্গিতে 'বাড়াবাড়ি' ছাড়াও কোন সত্য ছিল কিনা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্যায় সে আদৌ কোন ভূমিকা নিতে পেরেছিল কিনা, এবং সমকালের ও পরবর্তীকালের পত্র-পত্রিকা ও সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটির প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব কি ভাবে ও কতদূর পড়েছিল — এই সবের পর্যালোচনাই আমাদের বর্তমান আলোচনার মুখ্য বিষয়। আমরা অন্বেষণ করতে চাই বাংলা পত্রিকা-সাহিত্যের ইতিহাসে এবং আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের সেবায় 'শনিবারের চিঠি' কি অবদান রাখতে পেরেছে।

স্বভাবতঃই পত্রিকাটির অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপের খোঁজ ও তার আলোচনা আমরা বর্তমান বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে চাই নি। যদিও সাহিত্য-ক্ষেত্র ছাড়াও পত্রিকাটি সে সময়ের বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির সংস্কার-আন্দোলনে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে চেয়েছে। 'শনিবারের চিঠি'র রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টি— বিশেষ করে পল্লীচর্চা, শিক্ষা-সংস্কার, গবেষণা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গৌরবের। এমন কি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পত্রিকাটি যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল, তা এই সামগ্রিক ধ্যান-ধারণারই অংশ। সুতরাং পত্রিকাটির প্রকৃত পরিচয় জানতে গেলে তার সমগ্র প্রয়াসেরই অন্বেষণ ও বিচার প্রয়োজন। কিন্তু তা পৃথক প্রযত্ন ছাড়া সম্ভব নয়। পরবর্তী কালে সেদিকের খোঁজ নেবার চেষ্টা আমরা করব।

বর্তমানের আলোচনা মূলতঃ আধুনিক সাহিত্য-কেন্দ্রিক। কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে, কি প্রয়োজনে, কেমন করে এই পত্রিকাটি উদ্ভূত হয়েছিল; পত্রিকাটির প্রাথমিক পর্বের উদ্দেশ্য কেন ও কেমন করে পরিবর্তিত হয়েছে, তার লেখক ও সম্পাদকদের পরিচয় ও বিবর্তনের সূত্র — এগুলিই হবে বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপট। এরই সূত্র ধরে তথাকথিত আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য ও প্রকাশরূপ, — বিশেষ করে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ ও তরুণ সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগের ভিত্তি, বিরোধিতার-ভঙ্গি ও প্রত্যাশিত

ফললাভের সীমা-প্রভৃতির সমীচীনতা ও কালোত্তীর্ণতা বিচারই হবে আমাদের মূল পর্যালোচনার বিষয়। প্রাসঙ্গিকবোধে 'শনিবারের চিঠির' ভূমিকা পালনে অশোক চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল, রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত প্রভৃতির ভূমিকার বিচারও আমাদের আলোচনায় মুখ্য স্থান পাবে।

খ. 'শনিবারের চিঠির উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য

বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'শনিবারের চিঠি' প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল ধরে (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে — অনিয়মিতভাবে হলেও — অদ্যাবধি) শুধু তার অস্তিত্বকেই বজায় রাখতে সক্ষম হয় নি, এক সময়ে সমগ্র দেশে সে একটা প্রচণ্ড বিতর্ক ও প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। পত্রিকাটি বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অভিভাবকত্বের দাবি করেছে এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারক ও বাহক হতে চেয়েছে। এই সকল কারণে কেউ কেউ এই পত্রিকাটিকে আয়ুষ্কালের দিক দিয়ে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন, এবং সৃষ্টিশীলতা, পরিচালনা ও মানসিকতার বিচারে কেউ বা এটিকে 'বঙ্গদর্শন', 'সাধনা', 'সবুজ পত্র', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে এক সারিতে বসাতে চান।

একটি বিশেষ যুগের বাংলা সাহিত্যে ও সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রে 'শনিবারের চিঠি'র তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যতটা ও যেভাবেই থাকুক না কেন, পত্রিকাটি কিন্তু সে রকম কোন সচেতন আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে আবির্ভূত হয় নি। পত্রিকাটির জন্মলগ্নে আদৌ কোন ইতিবাচক কর্তব্যের আভাসমাত্র ছিল না। ''যাঁদের উর্বর মস্তিষ্কে এই ক্ষীণ পত্রিকাটির পরিকল্পনা' প্রথম দেখা দিয়েছিল তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন — নিছক ব্যক্তি-বিশেষের 'খেয়ালের বশেই, 'মজা করার' জন্যই মাত্র সপ্তাহান্তে এই ছোট 'চিঠি'টি তাঁরা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। যেটুকু সামান্য সচেতন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য এ সময়ে দেখা দিয়েছিল — তা ছিল, পত্রিকাটির পরিকল্পনা-কার শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'উইট, হিউমার ও স্যাটায়ার রচনা'-প্রকাশের একটা মাধ্যম রূপে গড়ে তোলা, বড়জোর — দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'স্বরাজ্য'-রাজনীতিকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্যই এই মাধ্যমটির প্রয়োজন হয়েছিল, অশোক বাবুর পিতা শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'গুরুগম্ভীর প্রবাসীর পৃষ্ঠায় তাঁর এই রস-রসিকতা চরিতার্থ' হবার উপায় ছিল না বলেই তিনি এই পত্রান্তর প্রকাশের

সঙ্কল্প' করেছিলেন ।[২২]

পরবর্তীকালে 'শনিবারের চিঠি'র পরিচালনা-ভার শ্রী পরিমল গোস্বামীর হাতে ন্যস্ত করার সময় পত্রিকাটির ইতিহাস বলতে গিয়ে 'শনিবারের চিঠির' অধিনায়ক শ্রী 'সজনীকান্ত দাস যেভাবে স্মৃতিচারণা করেছিলেন, তাতেও পত্রিকাটির জন্ম-মুহূর্তের পরিকল্পনা বা আদর্শের কোন উল্লেখ ছিল না । 'শনিবারের চিঠি'র বিশিষ্ট চয়ে তিনি লিখেছিলেন —"১৩৩১ সালের আষাঢ় মাসের এক শান্ত-বর্ষণ সন্ধ্যায় উত্তর কলিকাতার হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্তের এক বেঞ্চির উপর বসিয়া চীনা বাদামের খোসা ছাড়াইয়া খাইতে খাইতে যাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে কল্পনা-রূপী 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম আবির্ভাব ঘটে তিনি সম্ভবতঃ আজ 'শনিবারের চিঠি'কে ভুলিয়াছেন । কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি সদ্য দেশে ফিরিয়াছেন । নূতন কিছু অদ্ভুত কিছু করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল । বঙ্গদেশের সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করিয়া শনিবারে শনিবারে একখানি চটি সাপ্তাহিক বাহির করিবার প্রস্তাব তিনিই করেন । 'শনিবারের চিঠি'র ইতিহাসে যাঁহার স্থান সর্বপ্রথম । যাঁহার নাম শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় । কল্পনা-ব্যাপারে যাঁহার সঙ্গী দুইজনও পশ্চাৎপদ ছিলেন না । শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস সম্পাদক ও মুদ্রাকর হইবেন স্থির হইয়া গেল । শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় হইলেন কর্মাধ্যক্ষ । বর্ষা রজনীর অন্ধকার আকাশের তলে গ্যাসালোকিত হেদুঁয়া পুষ্করিণীর তীরে 'শনিবারের চিঠি' নাটকের প্রস্তাবনা পাঠ হইয়া গেল ।" [২৩]

'শনিবারের চিঠি'র এক সময়ের ঘনিষ্ঠ সহচর, বিদগ্ধ অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক ডঃ সুকুমার সেনও পত্রিকাটির জন্মবৃত্তান্তের কথা স্মরণ করে উল্লেখ করেছেন —"আসলে কয়েকটি বিশিষ্ট সাহিত্যিককে লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ কৌতুক রসের যোগান দিবার জন্যই 'শনিবারের চিঠি' প্রথম বাহির হইয়াছিল ।"[২৪] মন্তব্যটি ঈষৎ পরবর্তী কালের জন্য (মূলতঃ 'শনিবারের চিঠি'র অষ্টম সংখ্যা থেকেই সাহিত্যিকদের ব্যাপার প্রাধান্য পেয়েছে ।) প্রযোজ্য হলেও মোটামুটি পত্রিকাটির আবির্ভাব-কালের পক্ষেও সত্য । কিন্তু ডঃ জীবেন্দু সিংহরায় প্রভৃতি আলোচকেরা যে মন্তব্য করেছেন — "শনিবারের চিঠি'র কোন সীরিয়াস আদর্শ ছিল না,"[২৫] তা পত্রিকাটি সম্পর্কে তাঁদের বিরক্তি থেকেই বিবৃত, - 'শনিবারের চিঠি'র সমগ্র জীবন সম্পর্কেই তাঁদের এই ধারণাটি প্রকাশ পেয়েছে । যাই হোক, তাঁদের এই মন্তব্য অন্ততঃ 'শনিবারের চিঠি'র উদ্যোগ-কালের পরিচয় সম্পর্কে সত্য ছিল ।

পরবর্তীকালে 'শনিবারের চিঠি'র "ভগীরথ" শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাটির সমর্থক ও সচেতন ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলতে চেয়েছেন, পত্রিকাটি যেন যুগের প্রয়োজনেই উদ্ভূত হয়েছিল । তাঁর মন্তব্য — "বঙ্গ সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন যুগে আমরা যে সকল নব নব প্রেরণার প্রকাশ লক্ষ্য করি, তাহাতে দেখা যায় যে সাহিত্যের স্বরূপ যুগ-ধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত । ... রবীন্দ্র-যুগে ভারতীয় সভ্যতার নবজীবন লাভ ও সংস্কৃত সাহিত্যের মহাযুগের আদর্শগুলিকে নূতন প্রাণ দান করিবার চেষ্টা । ....ওই যুগের বক্ষেই আশ্রয় লইয়া বহু নির্বীর্য লেখক কষ্ট-কল্পিত ও কৃত্রিম প্রেরণার অনুভূতির অভিনয় করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে এক সময়ে সত্য ও সুন্দরের ক্ষেত্রে অতি নিম্নে নামাইয়া দিয়াছিলেন । সেই একই সময়ে আমাদের জাতীয় চিন্তাধারার মধ্যে বহু নিম্নস্তরের বিদেশী উপ-আদর্শ আসিয়া পড়িয়া জীবন-প্রবাহের স্বচ্ছভাব নষ্ট করিয়া সকল কিছুই ঘোলাটে করিয়া তুলিয়াছিল । নবজাগ্রত 'একলাঘি', প্রগতি, তথাকথিত দেশসেবার ব্যবসায়, ইউরোপের বিকৃত মস্তিষ্ক হৃতযৌবন স্বাস্থ্যহীন শিল্পকলা, কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও চালচলনের ধাক্কা প্রভৃতি তৎকালীন মানসিক বিকার সমূহের ফিরিস্তিতে প্রকটভাবে উপস্থিত ছিল । 'শনিবারের চিঠি'র অভিযান আমাদিগের জীবন প্রবাহকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও সত্য-আকাঙ্ক্ষার পথে চালাইবার জন্য আরম্ভ হইয়াছিল'।[২৬] এটিও অনেক পরেকার কথা, — অন্ততঃ পত্রিকাটির 'মাসিক' জীবন (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) শুরু হওয়ার আগে নয় । 'শনিবারের চিঠি'র সাপ্তাহিক পর্বে ও তিনটি বিশেষ সংখ্যায় এ সকল কথা অবশ্যই কিছু প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তা ছিল খুবই হাল্কা চালে, যেন নিছক রস-রসিকতা' চরিতার্থ করার জন্যই ।

'শনিবারের চিঠি'র প্রচ্ছদ সম্পর্কেও নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, এবং সেই সূত্র ধরে অনেকে পত্রিকাটির আদর্শ ও উদ্দেশ্যেরও ইঙ্গিত পেয়েছেন । কেউ মনে করেছিলেন — পত্রিকাটিতে মহাজীবনের আহ্বান জানানো হয়েছে সমুদ্রের প্রতিভাসে, কেউ বা ভেবেছিলেন — পত্রিকাটিতে যে ক্যানুট-মার্কা ছবি দেওয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য, তাঁরা আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে শাসন বা সংযম আনতে চান । পরবর্তীকালে পত্রিকাটির মোরগ-লাঞ্ছিত প্রচ্ছদ সম্পর্কেও সমরূপ ও অন্যরূপ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু প্রচ্ছদগুলি যে নিতান্তই আকস্মিকভাবে ও সেই একই হাল্কা মেজাজের চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, সে কথা 'শনিবারের চিঠি'র কর্ণধার' শ্রী সজনীকান্ত দাস বার বার তাঁর 'স্মৃতি-কথায় উল্লেখ করেছেন ।

মন্তব্য, ব্যাখ্যা বা স্মৃতিচারণার কথা বাদ দিলেও 'শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত প্রথম দিককার রচনাদি বিশ্লেষণ করলেও পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ও প্রকাশের হেতু স্পষ্ট হয়ে উঠবে । বিশেষ করে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'মুখবন্ধে' ও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতিতে 'চিঠির' পরিচালকদের মানসিকতা, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা ঘোষিত হয়েছে ।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত (১০ই শ্রাবণ, ১৩৩১) 'মুখবন্ধ'টি লেখেন 'চিঠি'র 'ব্রহ্মা' স্বয়ং শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় ।[১৭] 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি 'স্বভাবধর্মের' ওপর জোর দিয়েছেন । তাঁর স্বভাব-সুলভ ভাষায় তিনি বলেন — "আজকাল 'নেই উদ্দেশ্য' এবং 'ক্রমস্ফুট উদ্দেশ্য'রই যুগ, এই যুগধর্ম পালনের ইচ্ছা না থাকলেও বলছি, আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই । এমন কি 'উদ্দেশ্য-হীনতা'ও আমাদের উদ্দেশ্য নয় । উদ্দেশ্য যদি কখনো আপনা-আপনি ফুটেও ওঠে, তাহলে আশা যে, আপনা-আপনি ঝরেও পড়বে । আমরা যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ আমাদের স্বভাবই আমাদের কখনো উদ্দেশ্যযুক্ত ও কখনো উদ্দেশ্যহীন করে চালাবে । উদ্দেশ্যের বা উদ্দেশ্য-হীনতার খাতিরে আমরা নিজেদের বিসর্জন দেব না । নিজেদের স্বভাব, জীবন ও অপরের ক্রম বিকাশের পথ ধরে চলতে চলতে আমাদের যা ভাল মনে হবে, আমরা তারই অনুসরণ করব । কোন নির্দিষ্ট পলিসির অনুসরণ করতে গিয়ে জীবন, স্বভাব ও চিরপরিবর্তনশীল হৃদয়াকাঙ্ক্ষাগুলিকে আড়ষ্ট ও প্রাণহীন করে ফেলব না । এই যে আমাদের উদ্দেশ্য — জগতে স্বাধীনতার প্রয়াস, এর ছায়া আমাদের সব কাজের উপর পড়বে ।" তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন —"ধর্ম জগতে আমরা কোন কিছুকে সাধারণতঃ অভ্রান্ত চিরসত্য অথবা শেষ বলে স্বীকার করব না । অবস্থা বিশেষে উত্তম, অধম, কার্যকরী বা অকেজো বলেই আমরা কোন মত বা ব্যক্তিকে বিশিষ্ট করব । অবশ্য ক্ষণিকের উন্মাদনায় আমরা কখনো কখনো পূর্ব-পুরুষদের পথ অবলম্বন করতে পারি । কিন্তু সে কথা আগে থেকে বলা যায় না । সামাজিক সকল ব্যাপারে আমরা আমাদের ছাড়া অপর কিছু বা কাউকে মানব না । ভৌগোলিক ক্ষেত্রে যেমন দূর দেশকে মানব না, সময়ের ক্ষেত্রে তেমনি অতীতকে মানব না । দূর বা অতীত আমাদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে আমাদের মধ্যে স্থান পেতে পারে, কিন্তু সে আমাদের মন ভুলিয়ে — জোর করে নয় । রাষ্ট্রকে আমরা বাদ দেব না । রাষ্ট্রীয়তা আমাদের একটা শক্ত রোগের মত চেপে ধরে রয়েছে । সেই রোগটিকে তাড়িয়ে বা দাবিয়ে আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে । একে অবাধে বেড়ে উঠতে আমরা দেব না । পারলে ওকে দিয়ে আমরা সুবিধামত অনেক কাজ করিয়ে

নেব ।" কর্মপন্থা সম্পর্কে আভাস দিতে গিয়ে বলা হয়েছে —"উপায়ের ক্ষেত্রে আমরা মুগুরকে হাতুড়ির উপরে জায়গা দেব । চাবুককে চাপড়ের চেয়ে বড় বলেই ধরব । এবং শিশু শিক্ষার উদ্দেশ্যে চিত্রে বেদান্ত প্রচারের চেষ্টা করব না । অনেক রকম গোলমালই আমরা বাধাব, কিন্তু অলমিতি বিস্তরেণ — শ্রী শঙ্করাচার্য ।"

যতই হাল্কাভাবে বলুন না কেন, 'শনিবারের চিঠির' গূঢ় উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত এখানে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে । যদিও সেই উদ্দেশ্যটি খুব স্পষ্ট ও সচেতন ইচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি । পত্রিকাটিতে প্রকাশিত নানা ধরণের রচনা তারই সাক্ষ্য । বরং পত্রিকাটির চরিত্র ধরা পড়েছে 'চিঠির অন্যতম দোসর শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ঘোষণা বা 'বিজ্ঞপ্তি'তে । পত্রিকাটি যে কৌতুক রসের জোগান দেওয়ার জন্যই পরিকল্পিত ও প্রকাশিত, এটি যে তাঁদের একান্ত ও যা-খুশি করার ব্যাপার, তার ইঙ্গিত আছে এই নিয়মাবলীতে । 'কর্মাধ্যক্ষ' জানিয়েছেন — " (১) সম্পাদক মহাশয়ের সহিত কোন কাজে দেখা করিতে হইলে দেখা পাইবার উপায় নাই, পত্র লিখিতেই হইবে । দরকার না থাকিলে পত্র লিখিবারও প্রয়োজন নাই । (২) লেখা চাই না । টাকা ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা — শনিবারের চিঠির কার্যালয়, ১০৫ অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । (৩) যাহার ইচ্ছা আমাদের যে কোন লেখার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তবে আমরা তাহা না ছাপিলে অন্য কাগজে ছাপিতে পারেন । (৪) এই রকম সব নিয়ম আমাদের দরকারমত মানিয়া চলিতে হইবে, — তবে দরকার মত নিয়ম বদলাইব এবং ভাঙিব । ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে আমাদের জানাইতে হইবে না, কারণ আমরা তাহা মানিব না ।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম কয়েক সংখ্যার সূচীপত্র পরীক্ষা করলেও পত্রিকাটির উদ্যোগ-কালীন আদর্শ ও ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায় । অষ্টম সংখ্যা থেকে শ্রী সজনীকান্ত দাস —"রীতিমত লেখক' রূপে এই পত্রিকায় যোগ দেবার, এবং 'শনিবারের চিঠি"পলিটিক্সের ক্ষেত্র থেকে সাহিত্য জগতে উত্তীর্ণ' হওয়ার আগে পর্যন্ত মোট ৭২টি রচনা প্রকাশিত হয়েছে । তার মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশি রাজা-রাজনীতি বিষয়ক, অল্প কয়েকটি সমসাময়িক সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকাকে নিয়ে, এবং সামান্য কিছু বিবিধ ও বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে । প্রতিটি লেখাতেই প্রকাশ পেয়েছে রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও নিছক কৌতুক করার প্রবণতা;'মুগুর' বা 'চাবুকে'র বদলে অনুভূত হয়েছে খোলা-চেটোর চাপড় বা সুড়সুড়ি । শ্রী সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন —"এক সংখ্যা, দুই সংখ্যা, তিন সংখ্যা — পরপর পাঁচ সপ্তাহে পাঁচটি সংখ্যা বাহির হইল । এক আনা হিসাবে পাঁচ আনা ব্যয় করিয়া সব

কয়টিই সংখ্যায় সংগ্রহ করিলাম এবং আয়ত্ত করিলাম । ঢং-ঢাং ধরণ-ধারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না । মজাই যেখানে মোদ্দা উদ্দেশ্য, সেখানে বুঝিবার হাঙ্গামা নাই । মজাতে আমারও আসক্তি ।''[২৭] কিন্তু তিনিও 'শনিবারের চিঠি'তে 'রীতিমত লেখক' রূপে যোগ দিয়ে এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে 'ভাগের মায়ের বোঝা' নিজের কাঁধে নিয়েও পত্রিকাটির সাপ্তাহিক পর্বে স্পষ্টতঃ তার চরিত্রগত কোন পরিবর্তন আনেন নি । এই সময়ে যেটুকু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, তা হল — প্রথমতঃ, অশোক-যোগানন্দ-হেমন্তের 'ত্রিচক্র যানটি এখন সজনীকান্ত ও মোহিতলালের সমন্বয়ে দ্বিচক্রযানে রূপান্তরিত হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ, 'শনিবারের চিঠি'র 'পলিটিক্সের ক্ষেত্র সাহিত্য অধিকার করেছে' । তৃতীয়তঃ, কল্লোলকে কেন্দ্র করে মাত্রাতিরিক্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কৌতুকের বাণ ছেড়েছে, এবং 'কল্লোলে' প্রকাশিত রচনা-বিশেষের — 'ভাষা ও ভঙ্গির তারল্য,' 'ত্রুটি-কণ্টকিত গল্প-কথিকার রেওয়াজ' ও অবাস্তবের সঙ্গে অতি-বাস্তবের বিচিত্র সংমিশ্রণ' প্রভৃতিকে নিয়ে 'হস্ত কণ্ডূয়ণ নিবৃত্তির চেষ্টার ফলে মন কষাকষি হয়েছে, উত্তাপ জেগেছে, এমন কি — 'দুই সখীর সহজ দৃষ্টি প্রায় অকারণ ক্রোধে কুটীল হয়ে উঠেছে ।' কিন্তু তবু সে সময়ে 'দুই সহোদরা দিতি ও অদিতির সন্তানদের মত 'শনিবারের চিঠি'র আর 'কল্লোলে'র কলহ বাধিবে, ইহার সম্ভাবনাও প্রত্যক্ষে অভাবনীয় ছিল ।' প্রকৃতপক্ষে তখন পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'র কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ও বলিষ্ঠ কর্মপন্থা দেখা যায় নি । উদ্যোগ-কালের হালকা মেজাজ ও মজা করার মোদ্দা উদ্দেশ্য' সমগ্র সাপ্তাহিক জীবন-ব্যাপী (মোট ২৭টি সংখ্যা) অব্যাহত ছিল ।[২৮] এমন কি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে, বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত তিনটি বিশেষ সংখ্যাতেও (১৫ই জ্যৈষ্ঠ—জুবিলী সংখ্যা', আষাঢ়ে —'বিরহ সংখ্যা' ও কার্তিকে 'ভোট সংখ্যা') সেই একই মানসিকতা লক্ষ্য করা গেছে — যদিও বক্তব্যে ও ভঙ্গিতে ঝাঁঝ ছিল খুবই বেশি । এই সময়কে বড় জোর, 'উদ্দেশ্যের প্রস্তুতি পর্ব বলা চলে ।

'শনিবারের চিঠি' সচেতন উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা নিয়ে অগ্রসর হয়েছে তার মাসিক জীবনের শুরু থেকেই । তাঁদের মতে ১৩৩৩ এর ''নূতন বৎসরের গোড়া হইতে জলকল্লোল হঠাৎ যৌন কল্লোল হইবার সাধনায় মাতিল''।[২৯] সেই স্রোতকে প্রতিহত করাই হল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য, এবং সেই ভাবেই তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন । ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত দেখা গেছে এই উদ্দেশ্যের প্রাধান্য । তারপর শুরু হয়েছে অন্য উদ্দেশ্য — সৃষ্টিশীলতার, — তাঁরা ''রোষের জগৎ থেকে রসের জগতে উন্নীত'' হতে চেয়েছেন । সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে গবেষণা ও সমাজ-উন্নয়নের নানা চিন্তা । স্বাধীনতা — উত্তীর্ণ কালে আবার দেখা গেছে আরও বিশিষ্ট উদ্দেশ্য — সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতির অনুধান । এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে — স্পষ্টতঃ

কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে, নবীনদের প্রতিভার আবিষ্কার ও আনুকূল্য দিয়ে 'শনিবারের চিঠি' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের -'এক বলিষ্ঠ ও অকৃত্রিম 'বটবৃক্ষ' হয়ে উঠেছে । সেইঅসাধারণ উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করে 'শনিবারের চিঠি'— সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে ও বাংলা সাহিত্যে নিজের বিশিষ্ট স্থানকে পাকা করে নিয়েছে ।

গ. 'শনিবারের চিঠি'র উদ্ভব ও পর্যায়

'শনিবারের চিঠি' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে সাপ্তাহিক রূপে।প্রকাশকাল —
১০ই শ্রাবণ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (২৬শে জুলাই, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

পত্রিকাটি ছাপা হত —'প্রবাসী' প্রেসে (৯১ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা)। কার্যালয়ের ঠিকানা — ১০৫ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । (ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের ঠিকানা) । বস্তুতঃ এটি ছিল "একতলায় রক্ষিত একটি ডাক বাক্স মাত্র।" শনিবারের চিঠির যাবতীয় কাজকর্ম হত প্রবাসী-প্রেসের দোতলায় "একটি প্রশস্ত কক্ষে"-'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'- এর সর্বময় কর্তা শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'খাস কামরায়' । 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডাও বসত সেখানে নিয়মিতভাবে ।

'শনিবারের চিঠি'র উদ্যোক্তা ছিলেন —'প্রবাসী'- সম্পাদক শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় । কর্মাধ্যক্ষ — শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় (রামানন্দবাবুর অন্যতম জামাতা)। সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর — শ্রী যোগানন্দ দাস (রামানন্দবাবুর পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ সুন্দরী মোহন দাসের পুত্র)। পত্রিকাটির ঊনবিংশ সংখ্যা থেকে সহ-সম্পাদক ছিলেন — শ্রী সজনীকান্ত দাস (২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১)। 'শনিবারের চিঠি'র মাসিক জীবনের গোড়া পর্যন্ত (পৌষ, ১৩৩৪) এই কাঠামো বজায় থাকে । প্রথম সংখ্যার লেখক ছিলেন উদ্যোক্তারা 'ত্রিচক্র' — অশোক-হেমন্ত-যোগানন্দ । পরে অবশ্য পত্রিকাটি চট্টোপাধ্যায়-গোষ্ঠীর পারিবারিক গণ্ডি অতিক্রম করেছে, এবং বাংলা দেশের বহু কৃতবিদ্য ও চিন্তাশীল লেখক এই পত্রিকায় আত্মনিয়োগ করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনামে ।

পত্রিকাটির আকার ছিল — ডবল-ক্রাউন ১৬ পেজি ২৪ পৃষ্ঠার । একটি খামের মধ্যে

চিঠির আকারে এটি প্রকাশিত ও বিতরিত হত । বিজ্ঞাপন ছিল নামমাত্র । দাম ধরা হয়েছিল এক আনা । পরে অবশ্য এটির আকার, পৃষ্ঠা, দাম ও বিজ্ঞাপনের সংখ্যা বেড়েছে । খামটি কবেই অদৃশ্য হয়েছে ।

সাপ্তাহিক পর্বে 'শনিবারের চিঠি'র প্রচ্ছদ ছিল — বহু বর্ণে ছাপা — চাবুকহস্তে সমুদ্র-শাসনরত এক ভীম অথচ সুঠাম বীর মূর্তি — রাজা ক্যানুটের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান । সামনে বনস্থলীর রেখা । দূরে হর্ম্যরাজি । পিছনে উত্তাল সমুদ্র । খামের ওপরেও একই প্রচ্ছদ ছাপা থাকত — সবুজ কালিতে । প্রচ্ছদ-শিল্পী — 'কল্লোলের প্রাণপুরুষ' শ্রী দীনেশরঞ্জন দাশ ।

মাত্র ২৭টি সংখ্যা প্রকাশের পর (৯ই ফাল্গুন, ১৩৩১) সাপ্তাহিকটির অপমৃত্যু ঘটে । অবশ্য এর আগেও পত্রিকাটির প্রকাশ সাময়িকভাবে দুবার দু'সপ্তাহের জন্য বন্ধ ছিল বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে (১১শ ও ২০শ সংখ্যায়) । পত্রিকাটির অকালমৃত্যু সম্পর্কে শ্রী সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে আর্থিক দুর্গতির কথা উল্লেখ করেছেন । 'শনিবারের চিঠি' ছিল শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'ব্যক্তিগত শখের' ব্যাপার, তার সমস্ত দায়-দায়িত্বই বহন করতেন তিনি ও তাঁর পরিবার । 'প্রবাসী' প্রেসে ছাপার জন্য গোড়ায় কোন খরচই হত না, পরে দেওয়া হত 'নামমাত্র খরচা' । তাছাড়া 'শনিমণ্ডলী'র সদস্যদের 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিউ'ও অন্যত্র চাকুরী দিয়ে এবং 'সস্তায় থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত' করে দিয়ে রামানন্দবাবু কিভাবে এঁদের সহায়তা করতেন, শ্রী সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে বারবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা উল্লেখ করেছেন । কিন্তু পত্রিকার জন্য খরচ তো ছিল, আর ছিল আড্ডায় 'ভূরিভোজের' ব্যবস্থা । পত্রিকাটিকে স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টাও তাঁরা করেছেন তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে । আর — সেখানে বারবার পেয়েছেন বাধা, বিপত্তি ।

শ্রী সজনীকান্ত দাস উল্লেখ করেছেন — "পত্রিকা যথারীতি সপ্তাহে সপ্তাহে বাহির হইত বটে, কিন্তু খরচা উঠিত না । উৎসাহী জন্মদাতারা প্রথম প্রথম চাঁদা তুলিয়া 'শনিবারের চিঠি'কে বাঁচাইবার কথা ভাবিয়াছিলেন । কিন্তু ভাবা পর্যন্তই । একমাত্র অশোকবাবুর পকেট শূন্য হইতে লাগিল । তাঁহার পকেটের বহরের কথা জানিতাম না বটে, কিন্তু হৃদয়ের বহরেই তিনি সব কাজ করিতেন । 'শনিবারের চিঠি'র জন্যই তিনি বারবার বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন ।" [৩০]

সুতরাং তাঁরা এক অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, — পরিকল্পনাটি 'শনিবারের চিঠি'র চরিত্রের উপযুক্তই বটে । সজনীবাবু স্মরণ করেছেন — 'শনিবারের চিঠি' যখন নিজের পায়ে

দাঁড়াবার চেষ্টা করেও বারবার শোচনীয় আর্থিক দুর্গতিতে পড়ে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম, 'পায়ের নীচে মাটি ক্রমশঃ সরে' যাচ্ছে,— ঠিক সেই সময়ে "অদ্ভুতকর্মা সিদ্ধেশ্বর ভাদুড়ীর সহিত পরিচয় ঘটে। তিনি ছিলেন বাংভাল্লা-বিশারদ, কথার যাদুকর, শুধু কথার জোরে শ্রোতার অন্তরের সাহারা মরুভূমিকে কুলুকুলু-কলধ্বনিময় স্বর্ণোদ্যানে পরিণত করিতে পারিতেন। ..... তিনি শুধু মুখের কথায় 'শনিবারের চিঠি'র বিজ্ঞাপনের যে স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া দেখাইলেন, তাহারই লোভে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও জোর করিয়া 'শনিবারের চিঠি' চালাইতে লাগিলাম। অশোক চট্টোপাধ্যায় সপ্তাহে সপ্তাহে 'আউট্ অব্-পকেট্' হইয়া বিপন্ন হইতে লাগিলেন।"[৩১] এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে, সিদ্ধেশ্বর ভাদুড়ীর পরামর্শ মত, 'শনিবারের চিঠি'র ২৩শ সংখ্যায় (১১ই মাঘ, ১৩৩১) একটি 'অদ্ভুত' বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা হয়েছিল —"অ্যাপ্লায়েড লিটারেচার সোসাইটি" & বা 'ফলিত সাহিত্যে'র বিজ্ঞাপন। কিন্তু তার ফল,— সজনীবাবুর ভাষায় — "সিদ্ধেশ্বর ভাদুড়ীর পরম আশ্বাস সত্ত্বেও 'ফলিত সাহিত্য' সুফলপ্রসূ হইল না। দুটি তিনেক অর্ডার বাবদ গোটা কয়েক টাকা পাইয়াছিলাম। কিন্তু গ্রাহক অপেক্ষা লেখকের আবেদন এত বেশি আসিতে লাগিল যে আমরা তিন সপ্তাহের মধ্যে ব্যবসায় গুটাইতে বাধ্য হইলাম।"

'শনিবারের চিঠি'র আর্থিক দুর্গতিকে অস্বীকার না করেও এই ক্ষীণ সাপ্তাহিকটির অকাল-মৃত্যুর কারণ তার চরিত্র ও কার্যক্রমেই ছিল। অবশ্য এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে দ্বিতীয়বার বিলাত-যাত্রা না করিলে এবং শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'শান্তিনিকেতন-প্রবাসী' না হলে, হয়ত 'প্রাণশক্তি নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও' 'শনিবারের চিঠি'র প্রাণহীন দেহ আরও কিছু দিন অব্যাহত রাখা হত। কিন্তু আসলে 'শনিবারের চিঠি'র বিশিষ্ট কোন উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা না থাকায় এর জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য-পার্টিকে ঠাট্টা-তামাশা যে বেশিদূর টানা চলে না, তা ওঁরা বুঝেছিলেন। তাই পরম উপলক্ষ পেয়ে (নজরুল) পত্রিকাটি আরও কিছুদিন বেশ ভালই চলেছিল। কিন্তু তাতেও তো সীমা আছে। 'কল্লোলে'-প্রকাশিত গদ্য-পদ্যকে নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচাও ক্রমশঃ ভোঁতা হয়ে এসেছে। কোন স্পষ্ট বক্তব্য 'শনিবারের চিঠি' এ সময়েও রাখতে পারে নি। তাই শেষ পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'কে মরতেই হল,— অবশ্য মরে গিয়ে সে নিজেকেই বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই 'শনিমণ্ডলী' পায়ের নিচে শক্ত মাটি পেয়েছেন এবং মাসিক জীবনের গোড়া থেকেই বস্তুভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছেন। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে সাপ্তাহিক পর্ব ও বিশেষ সংখ্যাগুলিকে 'শনিবারের চিঠি'র "প্রস্তুতি পর্ব" আখ্যা দেওয়া যায়।

১৩৩১ সালে মাত্র সাত মাসের জন্য (১০ই শ্রাবণ-১ই ফাল্গুন) আবির্ভূত হওয়ার পর প্রায় দীর্ঘ দুই বৎসরব্যাপী 'শনিবারের চিঠি' যেন তার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য 'ঘুমিয়ে ছিল', এই সময়কালে 'শনিচক্রে'র সদস্যেরা অন্যত্র — কখনো 'আনন্দবাজার পত্রিকায়, কখনো কলিকাতা রেডিও-তে, এবং মূলতঃ অন্যান্য পত্রিকায় নানাভাবে তাঁদের শক্তিসাধনার অনুশীলন চালিয়ে গেছেন । অবশ্য ১৩৩৩ সালে বিক্ষিপ্তভাবে তিনটি বিশেষ সংখ্যা তাঁরা প্রকাশ করেছেন 'খোদকর্তা' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সক্রিয় সহায়তায় । জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়েছে 'জুবিলী সংখ্যা' — যার উপলক্ষ ছিল প্রত্যক্ষভাবে তৎকালীন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল 'ভারতী' পত্রিকার জুবিলী সংখ্যাকে ঠাট্টা করা । আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ন্যাকামি ও অনাচার-প্রবণতাকে এই সংখ্যায় মাঝে মধ্যে বিদ্রূপ করাও হয়েছে । কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তৎকালে-প্রকাশিত সম্পর্ক-বিরুদ্ধ যৌনাচারকে কঠিনভাবে ধিক্কার জানানো হয়েছে পরের মাসে (আষাঢ়) প্রকাশিত 'বিরহ সংখ্যা'য় । ঐ বিশেষ সংখ্যাটির প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রী সজনীকান্ত দাস উল্লেখ করেছেন — ''কল্লোল তখনও উদগ্র হইয়া ওঠে নাই, ১৩৩২ সালের শেষ পর্যন্ত তাহার কলধ্বনিই কানে বাজিতে ছিল । তখন বাংলা সাহিত্যে ক্রিমিনলজি-সাইকলজির নামে বিবিধ নূতনত্বের সম্পাদন করিয়া আসর মাত করিয়া রাখিয়া ছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ; সেনগুপ্ত মহাশয়ই প্রধান । নূতন বৎসরের গোড়া হইতেই জল-'কল্লোল' হঠাৎ যৌন-কল্লোল হইবার সাধনায় মাতিল ।''[৩২] এরই প্রতিক্রিয়ায় ও প্রতিবাদে, — বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার নামে যে অনাচার-ব্যভিচার প্রবলভাবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল তাকে প্রবলতর শক্তিতে বাধা দিয়ে থামাতে চেয়েছিলেন তাঁরা, এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ 'বিরহ সংখ্যাটি'র প্রকাশ ও পরিকল্পনা তাঁরা করেছিলেন । পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যে মনোভাব, বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গি 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশ করেছিল, সেই বিশেষ অভিযানের পূর্বাভাস এই বিশেষ সংখ্যাটিতে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে । কয়েক মাস পরে প্রকাশিত (কার্তিক) 'ভোট সংখ্যা'র অবলম্বন ছিল ভিন্ন — সে সময়ের মিউনিসিপ্যাল ও আইন-সভার নির্বাচন উপলক্ষে শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য-পার্টির ভোট-ভিক্ষার অর্থহীনতাকে ঠাট্টা-তামাশা করা । কিন্তু এই সংখ্যাটিতেও আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের তির্যক মনোভাব গোপন থাকে নি । ফলতঃ এই তিনটি বিশেষ ও আকস্মিক সংখ্যাকে সমগ্র 'শনিবারের চিঠি'র জীবন ও তার অভিযানের বিশিষ্ট ধারাতেই বিচার কর দরকার । পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের অনেক উপাদান এই বিশেষ সংখ্যাগুলিতে পাওয়া যায় । বিশেষ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও একটু 'বাড়াবাড়ি' সে সময়ে

তথাকথিত প্রগতিশীল পত্রিকাগুলিতে প্রকাশ পাচ্ছিল, এবং তার প্রতিক্রিয়ায় ও প্রতিবাদে 'শনিবারের চিঠি' যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, — কী বক্তব্যে, কী প্রকাশ-রীতিতে, — তার সেই অভিযানের ভূমিকা-ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল এই বিশেষ সংখ্যাগুলি, — বিশেষ করে 'বিরহ সংখ্যাটি' ছিল এ ব্যাপারে প্রথম 'সর্বোদয়, অভিযান' । তাই 'শনিবারের চিঠি'র জীবনে এগুলিকে 'প্রস্তুতি পর্ব' হিসাবে অভিহিত করা চলে ।

'শনিবারের চিঠি'র প্রকৃত জীবন শুরু হয়েছে 'নবপর্যায়ে'– তার মাসিক সংস্করণ থেকে (৯ই ভাদ্র, ১৩৩৪) । এই-সময়েও পত্রিকাটির সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন শ্রী যোগানন্দ দাস । সহ-সম্পাদক-শ্রী সজনীকান্ত দাস, কর্মাধ্যক্ষ-শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, উদ্যোক্তা - শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় । পত্রিকাটির ছাপাখানা ও কার্যালয়— 'প্রবাসী' পত্রিকার অফিস । মোট ৬৪ পৃষ্ঠার দুই আনা দামের এই পত্রিকাটির প্রচ্ছদ-চিত্রেই মাত্র অভিনবত্ব দেখা গেছে । এই সংখ্যা থেকেই পত্রিকাটিতে বহু পরিচিত ও বহু বিতর্কিত মোরগ-লাঞ্ছিত প্রচ্ছদের ব্যবহার দেখা যায় । যদিও মোরগের সঙ্গে শনিগ্রহ যুক্ত হয়েছেন আরও অনেক পরে (১৩৩৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে) । প্রাথমিক পর্বের প্রচ্ছদে মোরগের গলায় 'মেলব্যাগ' ঝোলানো হয়েছে এবং তার সামনে উপবিষ্ট এক তরুণের হাতে চিঠি,— তাতে লেখা — "যাও পাখি বোলো তারে ...." । চিত্রকর - তখনকার বিখ্যাত কার্টুনিস্ট শ্রী বিনয়কৃষ্ণ বসু । ভিতরের পাতায় ব্যবহৃত হয়েছে সাপ্তাহিক পর্বের সেই 'ক্যানুট-মার্কা' ছবি । এ সম্পর্কে শ্রী সজনীকান্ত দাস বলেছিলেন —"গত পঁচিশ বৎসর বহু লোকে বহুবার মুরগীর অর্থ সম্বন্ধে আমাকে মুখে ও পত্রযোগে প্রশ্ন করিয়াছেন । হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রতীক, দীর্ঘ নিশাবসানে প্রত্যুষের আভাস ইত্যাদি নানা গুরু গম্ভীর ও মুখরোচক ব্যাখ্যা দিতে পারিতাম । কিন্তু আমার কোনটিই সত্য হইত না । আসল লক্ষ্য ছিল স্বরাজ্য-পার্টি এবং আদর্শ ছিল তদানীন্তন বাঙালী প্রেমিক সম্প্রদায়ের 'যাও পাখি বোলো তারে — "বয়েৎ মুদ্রিত চিঠির কাগজ । মোটের উপর ইহা ছিল আমাদের নিছক ছেলেমানুষী খেয়াল ।"[৩৩]

কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকাটি তার জন্মমুহূর্ত থেকেই বেশ আঁট-ঘাট বেঁধে অগ্রসর হতে চেয়েছে, এবং ভূমিষ্ঠ হয়েই 'প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত' হয়েছে । পত্রিকাটির বক্তব্যে ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে, . তার সংগ্রামের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতায় এবং সংগ্রাম পরিচালনার চতুর কর্মকৌশল ও শক্তি সংগ্রহে 'ছেলেমানুষী খেয়ালে'র পরিবর্তে একটা সদর্থক ভূমিকাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । শ্রী 'সজনীকান্ত দাসও বলেছেন —"১৩৩৪ সালের আশ্বিনে

মাসিকের আরম্ভ হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত এই সাত মাস কালকে শনিবারের চিঠির 'উদ্যোগ-পর্ব' বলিতে পারি ।"[৩৪]

এই উদ্যোগ-পর্বেই শুরু হয়ে গেছে 'তাল ঠোকা' ও মহৎ সংগ্রাম । আর সেই প্রবল সংগ্রামে হাল ধরেছেন সম্পাদক হিসাবে শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৩৩৪ সালের মাঘ সংখ্যা থেকে), এবং তার পরে শ্রী সজনীকান্ত দাস (১৩৩৫ সালের আশ্বিন সংখ্যা থেকে) । এটি ছিল যথার্থই 'সংগ্রাম পর্ব'। সজনীবাবুর ভাষায় —"মহী রাবণের পুত্র অহি রাবণের মত মাসিক 'শনিবারের চিঠি'ও ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত হইল । বালক অভিমন্যুও ইহাকে বলা চলে । 'কল্লোল', 'কালিকলম,' 'প্রগতি,' 'ধূপছায়া,' 'উত্তরা', চোখা চোখা অস্ত্র লইয়া মার্ মার্ করিয়া আসিল, শরৎচন্দ্র - নরেশচন্দ্র- রাধাকমল প্রমুখ সপ্তরথীও এই কৌরব অক্ষৌহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন । কুরুক্ষেত্র জমিয়া উঠিল ।"[৩৫] এই পর্বে (১৩৩৬ সালের কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত)— ২ বৎসর তিন মাস কাল ব্যাপী এঁরা অবিশ্রাম্য রকমের 'বিচিত্র মারের খেলা' ও স্পর্ধা দেখিয়েছেন । সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার ঘটেছিল । ইতিমধ্যে 'প্রবাসী'র আশ্রয় ঘুচেছে, এবং ২০৬ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটস্থ 'কার্তিক প্রেসে' পত্রিকাটির মুদ্রণ ও কার্যালয় হয়েছে । ২৫ আগস্ট ১৯২৯ 'রঞ্জন প্রকাশালয়' স্থাপিত হয়েছে । এবং ৩২।৫।১ বিডন স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে 'শনিরঞ্জন প্রেসের' সূচনা হয়েছে ।

'শনিবারের চিঠি'র তৃতীয় জীবন শুরু হয়েছে আবার দীর্ঘ দুই বৎসরের ব্যবধানে— ১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা থেকে । পূর্বের সাংগঠনিক ও অনুকূল বন্দোবস্ত এই পর্যায়ে অদৃশ্য হয়েছে । শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে ইওরোপে । শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রী যোগানন্দ দাস, শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখেরাও অন্যত্র সরে গেছেন । 'শনিবারের চিঠি'র হাল ধরেছেন শ্রী সজনীকান্ত দাস । শক্তি জুগিয়ে চলেছেন শ্রী মোহিতলাল মজুমদার ও অন্যান্য সহধর্মী-সাহিত্যিক যোদ্ধাগণ । এই পর্যায়ের 'শনিবারের চিঠি'তে পুরোপুরি 'স্বাধীন সত্তা' লক্ষ্য করা যায় । পত্রিকাটির আক্রমণও হয়েছে সর্বাত্মক ও বল্গাহীন । প্রথম পর্যায়ের সংগ্রামে দেখা গিয়েছিল মূলতঃ 'কল্লোল'-বিরোধ । দ্বিতীয় পর্যায়ে তা সম্প্রসারিত হয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, জলধর সেন সমেত প্রায় সমস্ত মহারথীকেই এঁরা প্রতিপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, — রবীন্দ্রনাথকেও একেবারে ছেড়ে দেন নি । চারিদিকে একটা 'ত্রাহি ত্রাহি রব' উঠেছিল । তৃতীয় পর্যায়টি যদিও সেই সংগ্রামেরই চূড়ান্ত পর্ব, তবু এটিকে মূলতঃ "রবীন্দ্র বিদূষণ পর্ব' বলেই চিহ্নিত করা চলে, কারণ তাঁকেই কেন্দ্র ও লক্ষ্য করে সংগ্রামটি পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়েছিল ।

উঁদের মতে —"১৩৩৬ বঙ্গাব্দেই তথাকথিত 'অতি-আধুনিক' সাহিত্যিকদের প্রধান প্রধান আশ্রয়গুলির অধিকাংশই কাহিল হইতে হইতে একে একে মরিয়া গেল। কলিকাতায় 'কল্লোল' স্তব্ধ হইল, 'কালি-কলমে'র কালি ফুরাইল, সদ্যোজাত 'ধূপছায়া' অন্ধকারে মিলাইয়া গেল; ঢাকায় 'প্রগতি' গতিহীন হইল, 'বীণা'র তার ছিঁড়িয়া গেল। 'হসন্তিকার বুড়া তরুণদের বাঁধানো দন্তবিকাশও মাত্র চার সংখ্যায় নিঃশেষ হইল। দৈনিক 'ফরওয়ার্ড'-আশ্রিত' আত্মশক্তি' ভোল পাল্টাইল"।[৩৬] এমনকি —"দগ্ধ হইবার পর ছাই উড়িবার পালাও শেষ হল। শনিবারের চিঠির অশনি 'মহাকালি' ও 'রবিবারের লাঠি' — 'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে 'জেহাদের শেষ চিহ্ন অর্থাৎ প্রতিপক্ষ নির্মূল, কিন্তু উঁদের শক্তি, দম্ভ ও আবেগ-চাঞ্চল্য তখনও অধীর, অফুরন্ত। তাই নতুন উপলক্ষেরও অভাব হয় নি। রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে বিরূপতা আগেই ছিল, তাতে ইন্ধন এসেছে 'চিঠি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মন্তব্য ও সেই উপলক্ষে তরুণদের উল্লাস। উঁদের সে সময়ে 'বয়স ছিল কম, রক্ত ছিল গরম' উঁরা তখন ছিলেন 'বেপরোয়া'। এই সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা তাতে 'আগুন ধরিয়ে' দিল। — আর তারই 'লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া' দেখা গেল এই পর্যায়ের সংখ্যাগুলিতে। সজনীবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন — "মোটের উপর আমাদের প্রতিহিংসা-পরবশতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল। আমাদের আহত ভক্তি ও অভিমানই যে ব্যর্থ বক্রোক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল, এই সহজ কথাটা সাধারণ পাঠক তো বুঝিলই না, রবীন্দ্রনাথও বুঝিয়াও বুঝিলেন না। ব্যবধান দুস্তরতর হইয়া উঠিল। এই ব্যাপারে নিতান্ত বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করিলাম যে, তখন পর্যন্ত রবীন্দ্র-লাঞ্ছনায় উল্লসিত হয় এমন লোকের সংখ্যা বড় কম নয়।"[৩৭] অজুহাত বা কারণ যাই-ই থাকুকনা কেন, এ কথা আজ স্পষ্ট করেই বলতে হবে, উঁরাও অবশ্য নিজেরাও স্বীকার করেছেন, — এই পর্যায়ের 'শনিবারের চিঠি' (শ্রী পরিমল গোস্বামীর যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত, — অন্ততঃ ১৩৩৮-এর চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত) একটি দুরপনেয় কলঙ্কজনক অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল। এর পর অবশ্য দেখা দিয়েছে — উদ্দেশ্য-বদলের আভাস, সৃষ্টিধর্মিতা। 'শনিবারের চিঠি'র মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে।

শ্রী সজনীকান্ত দাস উল্লেখ করেছেন —"'প্রবাসী'র চাকরী ছাড়া ও 'বঙ্গশ্রী'র চাকরী ধরা, অর্থাৎ ১৩৩৮ সালের কার্তিক হইতে ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত চোদ্দমাস 'শনিবারের চিঠি'তে অবিশ্রান্ত বেপরোয়া ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার-আক্রমণ চালাইয়া আমি বস্তুত নিজের ভাগ্যের সঙ্গেই পাঞ্জা লড়িতেছিলাম। .... বিড়াল কোণ লইলে যেমন রুখিয়া দাঁড়ায়, আমিও সেইরূপ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ভয়ে ও আশঙ্কায় মুহ্যমান অবস্থায় ভূতভয়গ্রস্তের রামনাম জপার মত কেবলই জপিতে ছিলাম - আমি আমি আমি।[৩৮]"

এই রকম দমবন্ধ পরিস্থিতির মধ্যে সজনীবাবু মেট্রোপলিটান্ প্রিন্টিং এ্যন্ড পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং শ্রী সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'উপাসনা' পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক হন (৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯) । চাকুরীর সর্ত অনুযায়ী তাঁকে 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছাড়তে হয় । 'শনিবারের চিঠি'র হাল ধরেন শ্রী পরিমল গোস্বামী । পরিমলবাবু ১৩৪৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক ও পরিচালক থাকেন । পত্রিকাটির ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় । পত্রিকাটির জীবনে 'উদ্দেশ্য বদলের আভাস' এই সময়েই স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছে । সজনী বাবু বলেছেন -- "প্রাণপূর্ণ প্রতিবাদে আর সে সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিল না । সংস্কার-মূলক গঠনকার্য্যে না হউক, সৃষ্টিধর্মী গঠন কার্য্যের দিকে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল । যাঁহারা কোদাল-কুড়ুলধারী ভাঙনের মজুর ছিলেন, তাঁহারা হাঁক ডাক পাড়িয়া গড়নের মজুরদের আহ্বান জানাইলেন । কুরুক্ষেত্রের শ্মশানভূমির উপরেই নূতন ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিল ।"[৩৯] এই কালে পুরাতনেরা তো ছিলেনই, বিশেষ করে —'মোহিতলাল মজুমদার অভিভাবক রূপে এবং সজনীকান্ত দাস পরোক্ষে সংযোগ রক্ষা করে চলছিলেন', সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের উদিত ও উদীয়মান বহু লেখক এই পত্রিকার আশ্রয়ে উপনীত হয়েছেন পরিমলবাবুর কৃতিত্বের ফলে । দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ক্রোধ ও তীব্র বিদ্বেষোদ্গারের পরিবর্তে তাঁর প্রসন্ন দাক্ষিণ্য-লাভের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুস্থ আলোচনার ধারা প্রকাশ পেয়েছে, পত্রিকাটিতে সমাজ ও ধর্ম বিষয়ক নতুন সুরও জাগতে আরম্ভ করেছে । পরিচালনার দিক দিয়েও একটা বিশিষ্টতা দেখা গেছে । পরিমলবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন – 'শনিবারের চিঠি'র যা-কিছু দেনা ছিল, তিনি ধীরে ধীরে তা শোধ করে দিয়ে পত্রিকাটিকে অনেকটা আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন । তাঁর আমলেই পত্রিকাটির ছাপাখানা ও 'রঞ্জন প্রকাশালয়' ২৫।২ মোহনবাগান রো-এ স্থানান্তরিত হয়ে মোটামুটি একটা স্থিতি পেয়েছিল, ১৩৪২ সালের শ্রাবণ মাসে ছাপাখানার জন্য মুদ্রণ যন্ত্রও ক্রীত হয়েছিল । পরিমলবাবু নিজেই উল্লেখ করেছেন— তাঁর আমলেই 'শনিবারের চিঠি'তে 'তৃতীয় পর্যায়' শুরু হয়েছে[৪০]। সজনীবাবুও স্বীকার করেছেন – পরিমলবাবুর আমলেই 'শনিবারের চিঠি' "শুধু- সাহিত্যিক সমাজের কৌতূহলোদ্দীপক পত্রিকা হইতে ধীরে ধীরে একটা সার্বজনীন রূপ" নিয়েছিল । অবশ্য তিনি এই পরিবর্তনকে পত্রিকাটির স্বাভাবিক বিবর্তন-বৈশিষ্ট্য বলেই বিশ্বাস করেছেন ।[৪১]

'শনিবারের চিঠি'র চতুর্থ পর্যায় শুরু হয়েছে 'বঙ্গশ্রী' -- ফেরৎ সজনীকান্তের 'শনিবারের চিঠি'তে আজীবন পুরোপুরি আত্মনিয়োগের সময় থেকে (১৩৪৩ সালের শ্রাবণ

সংখ্যা থেকে) । ইতিমধ্যে 'শনিবারের চিঠিতে সুস্পষ্ট 'পালাবদল' ঘটেছে, নবীন-প্রবীণ বহু লেখক এই পত্রিকায় এসেছেন, সজনীবাবুও 'বঙ্গশ্রী'তে থাকাকালীন সময়ে "অনেক দেখেছেন, অনেক শিখেছেন", অগণিত লেখক ও মনীষীর অন্তরঙ্গতা লাভ করেছেন, বাংলা দেশের একজন দক্ষ সম্পাদক, গুণী মনীষী ও সাহিত্যিক রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন । সুতরাং তাঁর প্রত্যাবর্তনে 'শনিবারের চিঠি' একটা সার্বজনীন রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল । বিশেষ করে কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক বিস্তৃত ও উদার আনুকূল্য দান করেছিল । 'শনিবারের চিঠি'র অম্ল-তিক্ত পুরাতন স্বাদের জেরকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা 'সংবাদ-সাহিত্যে' মাত্র দেখা গেলেও তার স্বাদেরও তারতম্য ঘটেছে । দ্বিতীয়ত এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করে এবং গবেষণা-ধর্মী ও সমালোচনা সাহিত্যের ওপর জোর দিয়ে সজনীবাবু পত্রিকাটিকে সচেতন বাঙালীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন । সাহিত্য-বিষয়ক রচনাদি ছাড়াও এই পর্যায়ে 'শনিবারের চিঠি' সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারকাজে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সেবায় একটা সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে । এ কথা আজ স্বীকার করতে দ্বিধা জাগে না যে অন্ততঃ পঞ্চাশের দশকে ৫৭ নং ইন্দ্র বিশ্বাস রোড (সজনীকান্তের নিজ বাড়ি ও 'শনিবারের চিঠি'র কার্যালয় — 'রঞ্জন প্রকাশালয়ে'রও) একটা সাহিত্যিক পরিবেশ, অন্তত একটা লেখক-গোষ্ঠীর আশ্রয় হয়ে উঠেছিল । গবেষক শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন — "সজনীকান্ত দীর্ঘকাল বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সাময়িক পত্র সম্পাদন করিয়াছেন, 'শনিবারের চিঠি' পরিচালনা ও সম্পাদনা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কীর্তি বলিয়া গণ্য হইবে । নূতন লেখকগোষ্ঠি সৃজনে 'শনিবারের 'চিঠি'র প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়"[৪২]

সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে বলেছিলেন — " ১৭ হইতে ৭১ - মোট ৫৪ বৎসরের ফলপ্রসূ জীবন মানুষের । .... আমার গবেষণা-লব্ধ ১৭ হইতে ৭১ — এই ৫৪ বৎসরকে তিন অংশে বিভক্ত করিলে ১৮ বর্ষের সমান তিনটি পর্ব পাই । প্রথম পর্বে মানুষ বহিঃকেন্দ্রিক থাকে, দ্বিতীয় পর্বে হয় আত্মকেন্দ্রিক এবং তৃতীয় পর্বে আমার উচিৎ বাহির ও অন্তরের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া -ইষ্টকেন্দ্রিক হওয়া ।[৪৩] 'শনিবারের চিঠি'র জীবনেও এই তিনটি পর্বের সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে । সাপ্তাহিক জীবন ও বিশেষ সংখ্যা তিনটি এই পত্রিকার 'জীবনের' উপাদান বা ভূমিকা মাত্র । ১৩৩৪-১৩৩৮ এই সময়কালকে পত্রিকাটির প্রথম পর্ব বা 'বহিঃকেন্দ্রিক' জীবন বলা যায় । ১৩৩৯-১৩৪৩ এই সময়কালকে, বা আরও একটু পিছিয়ে — ১৩৪৮ (রবীন্দ্র-বিয়োগকাল) পর্যন্ত সময়কে বলা যায় পত্রিকাটির

দ্বিতীয় পর্ব বা 'আত্মকেন্দ্রিক' জীবন । এর পরের ইতিহাস- পত্রিকাটির জীবনে সত্যই 'ইষ্ট-কেন্দ্রিক' আবেদন সৃষ্টি করেছিল । পত্রিকাটির সমগ্র জীবনের বিস্তারিত বিশ্লেষণে এই সত্যটি প্রকাশ পেলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা পরিচ্ছন্ন ও পরিপূর্ণ পরিচয় নিয়ে একটা বিশেষ যুগ স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে, এবং 'শনিবারের চিঠি'রও যথার্থ ভূমিকা বিচারসহ ভিত্তি পাবে । বর্তমান আলোচনায় আমরা সংস্কারশূন্য দৃষ্টিতে সেই প্রয়াসই করতে চাই ।

ঘ. 'শনিবারের চিঠির 'আড্ডা' ও লেখক

পত্র-পত্রিকাদির উদ্ভব ও ইতিবৃত্ত, তাদের বিশিষ্টতা, ভূমিকা ও অবদান প্রভৃতির পরিচয় পেতে গেলে ঐ পত্রিকা-সমূহের কার্যালয়ে বা প্রেসে জমানো তাদের নিজস্ব সাহিত্যিক, বিদগ্ধজন ও অন্তরঙ্গ গুণগ্রাহীদের আড্ডার খোঁজ দরকার হয় । শুধু পত্রিকাদির পরিচয়ের সূত্র হিসাবেই নয়, এই সকল মজলিশের দর্পণে ধরা পড়ে সমকালীন সাহিত্য-ভাবনা ও সাহিত্য-সাধনার সামগ্রিক রূপ । তাই ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে এই সকল আপাত-তুচ্ছ মুখরোচক ইতিবৃত্তের এত কদর ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্বে 'বঙ্গদর্শন', 'সাধনা', 'ভারতী', প্রভৃতি পত্রিকার গুরুত্ব অসামান্য ছিল । এই পত্রিকাগুলি কেবল মহৎ সৃষ্টির আধার স্বরূপই ছিল না, এই পত্রিকাগুলির আশ্রয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উৎসাহী ও অনুরাগী লেখকদের নিয়ে একটা সমধর্মী সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গঠন করে বাংলা দেশে 'নতুন যুগ'কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন । এই সকল আসর,রস- রসিকতায়, মনন ও কল্পনার গভীরতায়, সাধনার অতন্দ্রতায়, আলোচনা ও বিতর্কে সে সময়ের বাংলাদেশে একটা সুস্থ ও দৃঢ় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল । অবশ্য এই সকল আসর ছিল একান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক,— বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় সীমাবদ্ধ । 'আড্ডা'র সার্বজনীনতা সেখানে গড়ে উঠতে পারে নি । পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র আশ্রয় 'সবুজসভা'ও ছিল এই গোত্রের ।

আড্ডার সার্বজনীন রূপ প্রকৃতপক্ষে প্রথম দেখা গেল 'ভারতী' পত্রিকার শেষের দিকে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মণিলালের আসরে' । 'কান্তিক প্রেসে'র এই আসরে সে সময়ের 'নব্য লেখক', শিল্পী ও বিদগ্ধব্যক্তিরা একদিকে যেমন সকলেই ছিলেন তুল্য-মূল্য, তেমনি

তাঁদের সেই গোষ্ঠীতেই জন্ম নিয়েছে বিশ শতকের বিশিষ্ট সাহিত্য-ভাবনা । সে সময়ে অবশ্য 'মানসী', 'নারায়ণ' প্রভৃতি রক্ষণশীলদের আসরেও বিশিষ্ট সাহিত্যাদর্শ চর্চিত হয়েছে, এবং বাংলাদেশে একটা জনমত সৃষ্টি করতে চেয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত দিব্য প্রতিভার অভাবই এই সকল সম-প্রাণ আড্ডার একমাত্র কারণ নিশ্চয় নয়, -বিশ শতকে যে গোষ্ঠী-চেতনা জাগতে আরম্ভ করেছিল, তাও সাহিত্যিক আড্ডার বিবর্তনে সাহায্য করেছে । এই সব 'আড্ডায়' পত্রিকা বিশেষের পরিচালক বা সম্পাদক একটা যোগসূত্র-হিসাবে কাজ করেন । সকলের সমবেত মানসিকতা ও প্রয়াসে যে বিশিষ্ট 'সাহিত্য-ধর্ম' গড়ে ওঠে, তিনি আসরের মধ্যমণি হিসাবে তাকে শুধু সমন্বিতই করেন না, তাকে সেই বিশিষ্ট রূপে গড়ে তুলতে একটা সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেন ।

শ্রী সজনীকান্ত দাস বিশ শতকের বাংলাদেশের সাহিত্যিক আড্ডা সমূহের একটা মনোজ্ঞ তালিকা দিয়েছেন । হাল্কা সুরে ও গোষ্ঠীগত দৃষ্টিতে বলা হলেও, এই তালিকা অসম্পূর্ণ হলেও, সমকালীন পত্র-পত্রিকা ও বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি সার্থক-ভাবে ফুটে উঠেছে । তিনি লিখেছেন —"সেকালে কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজ উদ্দেশ্যহীন আড্ডা দিতে জানিত । সুকিয়া স্ট্রীটের কান্তিক প্রেসে ভাঙা 'ভারতী' দলের আড্ডা, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে গজেন্দার বাড়িতে সর্বদলীয় সাহিত্যিকদের কিঞ্চিৎ আদি-রসাশ্রিত আড্ডা, পটল ডাঙায় 'কল্লোল' দলের বোহেমিয়ান আড্ডা, কলেজ স্ট্রী মার্কেটের উপর পাশাপাশি বরদা এজেন্সীতে 'কালি-কলমের' এবং আর্য পাবলিশিং হাউসে শশাঙ্ক বন্ধুদের অপেক্ষাকৃত উন্নাসিক আড্ডা, এম.সি. সরকার এণ্ড সন্স্- এর দোকানে শিশু সাহিত্যস্রষ্টা ভ্রমন-বিশারদ ও যাযাবরদের রাজা-উজীর-মারী আড্ডা (যা পরে 'হসন্তিকা'র আড্ডায় পরিণত), 'উপাসনা' কার্যালয়ে রাজনীতি-গন্ধী সাহিত্যিকদের আড্ডা, 'আনন্দবাজার' গৌরাঙ্গ প্রেসে লাপসি গেরুয়া-ভক্ত-সঙ্কটত্রানী সাংবাদিকদের পলিটিকো - সোস্যাল -লিটারেরী আড্ডা, 'বর্মবাণী' আপিসে বিশ্ববিদ্যালয়-আশ্রিত পণ্ডিত-সাহিত্যিকদের আড্ডা এবং 'বিচিত্রায়' অভিজাত সাহিত্যিকদের আড্ডা প্রধান ছিল । কয়েকটি ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতেছিল, কয়েকটির ভাঙন-দশা । কিন্তু আমাদের 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা রসে ও রঙে, চায়ে ও সিগারেটে অন্য সকল আড্ডাকে প্রায় ছাড়াইয়া উঠিতেছিল ।"[৪৫]

ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় এই সময়কার আড্ডার বিবরণ প্রসঙ্গে শ্রী সজনীকান্ত দাসের মন্তব্যকে কার্যতঃ সমর্থন করেছেন । ডঃ সিংহরায় বলেছিলেন — "মানসী বা মানসী ও মর্মবাণী'র কার্যালয় অর্থবান জমিদার জগদিন্দ্রনাথের মতো সভা-শোভন ব্যক্তিত্বে কিছু লোককে

টেনেছিলো বটে, ওদের আশে পাশে লেখকদের আনাগোনা ছিলো বটে, তবু তার আড্ডায় বিশেষ কোন সাহিত্যিক তাৎপর্য ছিলো না। অনেক আগেকার 'প্রবাসী'র কিছু সহ-সম্পাদক ও লেখক কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু আড্ডা জমাতেন বটে, কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো সীরিয়াস ও কর্মিষ্ঠ সম্পাদকের ছত্র-ছায়াতলে বসে সাহিত্যিক মধুচক্র রচনা করার মতো স্বাধীনতা ছিলো না। বরং 'প্রবাসী' গোষ্ঠির আড্ডা 'যোগানন্দ- হেমন্ত- অশোকের 'ত্রিচক্রযানে' চড়ে' পরবর্তিকালে 'শনিবারের চিঠি'র দপ্তরে গিয়ে কিছুটা সোরগোল তুলেছিলো। 'ভারতবর্ষ' ও 'মাসিক বসুমতী'র কর্তৃপক্ষ ব্যবসা ও প্রচার যতটা বুঝতেন, আড্ডায় সাহিত্যিক মনের কণ্ডুয়নের তাৎপর্য ততটা বুঝতেন না। তাই তাঁদের ভিতরে-বাইরে কোনো আড্ডার সাক্ষাৎ মেলে না। 'জাহ্নবী', 'উপাসনা', 'যমুনা', 'নারায়ণ' ইত্যাদির আড্ডা ছিলো বিশেষত্বহীন।"[৪৫]

কিন্তু শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল—'শনিবারের চিঠি'র আড্ডার কোন বিশেষত্বকেই স্বীকৃতি দিতে চান নি। তার মতে —"ওঁদের আড্ডার অন্যতম স্থল ছিলো 'বাসন্তী কেবিন', অর্থাৎ চায়ের দোকান। আর একটা আড্ডা 'প্রবাসী'র গেটের সংলগ্ন বিপিন বাবুর হোটেল।" [৪৬]

অবশ্য গোড়ার দিকে 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা ছিল তাই-ই। শ্রী সজনীকান্ত দাসের ভাষায় — "সারকুলার রোডের উপরে প্রায় সুকিয়া স্ট্রীট্ জংশনের কোণে বিপিন বাবুর চায়ের দোকান ছিল। .... যোগানন্দদা আর আমি দিনরাত্রির প্রায় সকল প্রহরেই খরিদ্দার ছিলাম। সুবল, মোহিতলাল আসিতেন সকাল-বিকাল। অধুনা বাঁকুড়া শহরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত, উখড়ার জমিদারদের পারিবারিক ডাক্তার বিরিঞ্চিবিলাস রায়, কলিকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও পরে পাটনার 'ইণ্ডিয়ান নেশনে'র সম্পাদক ডক্টর শচীন সেন, পক্ষিতত্ত্ববিদ সুধীন্দ্রলাল রায়, কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজের অনেক কৃতী ছাত্র — পরে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, যতীশচন্দ্র সেন, জীবনময় রায়, সুধী নলিনীকান্ত দে, ডাক্তার শরদিন্দু ঘোষাল, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, এবং কখনও কখনও অশোক চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিও বিপিনবাবুর পান্থশালায় পদার্পণ করিয়া এক পাত্র চায়ের প্রত্যাশায় বসিতেন। দোকানের নানা দিক হইতে রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য-বিজ্ঞানের নানা ধারা প্রবাহিত হইয়া পরস্পর কাটাকুটি করিত — হট্টগোলে কান পাতা দায়।"[৪৭] বলা বাহুল্য ওঁরা অনেকেই 'শনিমণ্ডলী'র ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন।

এ ছাড়া ছিল 'প্রবাসী' অফিসের অন্তর্গত মতিবাবুর দোকান । সেখানেও ছিল — ''ডিম, মাংস, পাঁউরুটি, পুডিং এবং কয়েক প্যাকেট্ ট্যাট্লার সিগারেট ধ্বংস''— সহ জমাটি আড্ডা । এই দোকানেই 'রঞ্জন প্রকাশালয়ে'র গোড়াপত্তন হয়েছিল বলে সজনীবাবু উল্লেখ করেছেন ।[৪৮]

বস্তুতপক্ষে সে সময় 'শনিবারের চিঠির অফিস' বলতে বোঝাত ৯১ নং আপার সারকুলার রোডের দ্বিতলে 'প্রবাসী' অফিসেরই অতি ক্ষুদ্র একটি ঘর — ''ঘরটির মাঝখানে একটি সেক্রেটারিয়েট্ টেবিল, তাহার কেন্দ্রস্থলে অশোক চট্টোপাধ্যায়, আশে-পাশে চেয়ারে টুলে বেতের সোফায় জানালার খাঁজায় আট-দশ জন আড্ডাধারী বসিয়া এবং একসঙ্গে শিক-কাবাব পরোটা ও সিগারেট চলিতেছে এবং কেহ কেহ 'শনিবারের চিঠি' খামে ভরিতেছেন ।''[৪৯] খাওয়া-পর্বের সঙ্গে একসঙ্গেই সকলের পত্রিকার কাজ করা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের ওপরে আলোচনা ছিল সেই আসরের অঙ্গ । এই আসরটি সম্পর্কে শ্রী সজনীকান্ত দাস অন্যত্র মন্তব্য করেছেন — ''স্বতন্ত্র ঘর বা আশ্রয় ছিল না । 'প্রবাসী' প্রেসের ম্যানেজারের অপ্রশস্ত কক্ষই আড্ডার যাদুস্পর্শে বৃহদায়তন হইয়া উঠিত । নীরদ, অশোক, যোগানন্দ ও আমি তো সর্বদা থাকিতামই, মোহিত, হেমন্ত, গোপাল, হরিপদ, সুনীতিকুমার, কালিদাস এবং ঢাকা রংপুর ও পাটনা হইতে আসিলে সুশীল, রবি ও রথীন নিয়মিত আসিতেন । এতদ্ব্যতীত কবি হেমচন্দ্র বাগচী, অধুনা-নিরুদ্দিষ্ট কবি সুবল মুখোপাধ্যায়, বন্ধু সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি জীবনময় রায়, হিরণকুমার সান্যাল, দিলীপ সান্যাল, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ জীবনকালী রায় সুবিধা পাইলেই আসিয়া জুটিতেন । ...... এই আড্ডাই 'শনিবারের চিঠির প্রাণ ছিল । বিপিন বাবুর রেস্টুরেন্টে এবং মতিবাবুর চায়ের দোকানে মাঝে মাঝে আড্ডা স্থানান্তরিত হইত, তখন খরচের ভার পালা করিয়া বহন করা হইত । আমরা কচিৎ কদাচিৎ গজেনদার আড্ডায়, আনন্দবাজার গৌরাঙ্গ প্রেসের আড্ডায়, অথবা কালিকলমের আড্ডায় গিয়া যোগ দিতাম । অন্যত্র আমাদের গতিবিধি ছিল না । কিছুকাল পরে অবশ্য 'প্রবাসী' প্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়া আমরাই 'কান্তিক প্রেসের ভাড়া বাটে আসর জমাইয়াছিলাম ।''[৫০]

দ্বিতীয় পর্বের 'শনিবারের চিঠি'র কিংবদন্তী-সৃষ্টিকারী আড্ডা বসে ৫ সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটস্থ 'শনিবারের চিঠি'র কার্যালয়ে । এই আড্ডাটি ছিল দীর্ঘায়ু । পরবর্তীকালে সজনীবাবু 'বঙ্গশ্রী'তে যোগদান করলে 'শনিবারের চিঠি'র 'কার্যত সর্বাধিনায়ক' শ্রী পরিমল গোস্বামী এই আড্ডাকে আরও পরিপুষ্ট ও বৃহত্তর কলেবর দান করেন । 'বঙ্গশ্রী'-প্রত্যাগত

সজনীকান্তের আগমনে এই আড্ডাটি হয় 'বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের সত্যিকারের রাইটার্স্ বিল্ডিং'। এই আড্ডার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — "রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে 'শনিবারের চিঠির আপিস । ... চকমেলানো বাড়ি । উঠানের চারিপাশে ঢাকা রোয়াক বা বারান্দা । সেই বারান্দায় বেশ জবরদস্ত কাঠামো — মোটা নাক, বড় উগ্রদৃষ্টি চোখ, ফরসা রঙ, চেয়ারে বসে গড়গড়ায় রবারের নল লাগিয়ে তামাক টানছে (সজনীকান্ত) ।"[৫১]

শ্রী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 'উপাসনা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই আড্ডার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে — "শনিবারের চিঠির যাহারা লেখক এবং উৎসাহদাতা তাঁহাদের লইয়া রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, শ্রী সজনী কান্ত দাস ইহার মধুচক্র । তাঁহাকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিয়া ফেরেন শ্রী যোগানন্দ দাস, শ্রী প্রমথনাথ রায়, শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি । শ্রী মোহিতলাল মজুমদার, ডক্টর সুশীল দে, ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ইহার পৃষ্ঠপোষক । ওঁদের সঙ্গে আরও যাঁরা ছিলেন — রবীন্দ্রনাথ মৈত্র রংপুর ছেড়ে পাকাপাকি রকম ডেরা বেঁধেছেন, দীর্ঘ বিরোধের পর কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন হয়েছে, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় হয়েছেন ফ্রেণ্ড্ ফিলজফার্ এণ্ড্ গাইড্, মনিটার ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' অফিসের চাকুরী অন্তে গৃহ প্রত্যাবর্তনের মুখে দৈনিক রোঁদ দিতেন, নলিনীকান্ত সরকার প্রায়শঃই প্রথমার্ধে উৎসাহ বর্ধন করে দ্বিতীয়ার্ধে সরে পড়তেন, শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিতও প্রায়ই আসতেন । এমন কি দীনেশরঞ্জন - মুরলীধর - যুবনাশ্ব সহ গোটা 'কল্লোল-কালিকলম' দলটাই এখানে সমবেত হয়েছেন ।"[৫২]

শ্রী সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' অনুসারে আরও যে সব সাহিত্যিক, পণ্ডিত,শিল্পী ও মনীষী রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের এই আসরে সামিল হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন — সাহিত্যিক শ্রী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রী বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্রশেখর, রতীন হালদার, চিত্রশিল্পী শ্রী যতীন্দ্রকুমার সেন, শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রগতিশীল লেখক শ্রী গোপাল হালদার, শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী প্রমথনাথ বিশী, শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, পণ্ডিত- মনীষী- ডক্টর কালিদাস নাগ, ডক্টর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, ডঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডঃ রামচন্দ্র অধিকারী প্রমুখ অসংখ্য উদিত ও উদীয়মান প্রতিভা । পূর্বের-শত্রু-শিবির থেকেও এসেছেন প্রায় সকলেই । রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের এই আড্ডাটি হয়ে উঠেছে

বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের তীর্থক্ষেত্র। বহু লেখকের আত্মকথায় ও স্মৃতিচারণে এই সত্যটি স্বীকৃত।[৫৩]

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের উক্ত ঐতিহাসিক আড্ডাটি ছাড়াও 'শনিবারের চিঠি'র আরও কয়েকটি আড্ডা বা মজলিসের কেন্দ্র ছিল। কান্তিক প্রেসে 'ভাঙা ভারতী'র আড্ডাকে দখল করে নেওয়ার কথা সজনীবাবু উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ছিল মোহন বাগান রো, বিডন স্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে 'শনিবারের চিঠি'র প্রেস, কার্যালয় বা অফিসের আড্ডা। এমন কি - বাদুড় বাগান লেনের মেসবাড়ি, ইউরোপীয় অ্যাসাইলাম লেনের দ্বিতলস্থ ফ্ল্যাট্ প্রভৃতিও ছিল এঁদের আড্ডার স্থল। সম-মনোভাবাপন্ন আড্ডাধারীদের নিয়ে এই আড্ডাগুলি 'শনিমণ্ডলী'র চিন্তা, সাধনা ও কার্যক্রম উদ্ভাবনে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। এ সম্পর্কে অনেক মুখরোচক ও কৌতূহলী খবর দিয়েছেন সজনীবাবু, পরিমলবাবু ও অন্যান্যরা।

এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গশ্রী'তে থাকাকালীন ৫৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ ভবনে এবং সজনীবাবুর শেষ জীবনে তাঁর নিজস্ব বাড়ি ৫৭ নং ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় এই সকল স্থানে প্রকৃতপক্ষে "সজনীকান্তকে ঘিরে নতুন কালের সাহিত্যরথীর সমাবেশ হত নিত্য ও নিয়মিত।"[৫৪] 'শনিবারের চিঠি'র পরিচয়, তাদের আড্ডা ও লেখক-সম্প্রদায়ের কথা এবং বাংলার সংস্কৃতি-জগতের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটির অবদান জানতে গেলে এই সকল তথ্য যথেষ্ট সহায়ক। 'শনিবারের চিঠি'র এই সকল আড্ডাধারী লেখকদের দলকে কখনো বলা হত 'শনিমণ্ডল' কখনো বা 'শনিচক্র'। এ সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'র আদি-সম্পাদক শ্রী যোগানন্দ দাস লিখেছিলেন —"শনিবারের চিঠিকে কেন্দ্র করিয়া প্রথমে 'প্রবাসী' কার্যালয়ে এবং পরে 'শনিবারের চিঠির নিজস্ব কার্যালয়ে সাহিত্য ও শিল্পের সেবক ও রসিকদের আসর নিয়মিত জমিয়া উঠিত। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠির আমলে এবং মাসিক 'শনিবারের চিঠির প্রথম আমলে এই আসরটি 'শনিমণ্ডল নামে পরিচিত ছিল।"[৫৫] অন্যত্র তিনি লিখেছিলেন —"মাসিক 'শনিবারের চিঠির পরবর্তী আমলে সজনীকান্ত আসরের মধ্যমণি হইয়া ওঠেন এবং মোহিতলালের প্রভাব এ সময়ে বহুকাল পর্যন্ত আসরটিকে এবং 'শনিবারের চিঠির সাহিত্যসৃষ্টি ও নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই আমলের আসরটিকে অনেকে 'শনিচক্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পূর্বতন 'শনিমণ্ডলে'র কয়েকজন সদস্য 'শনিচক্রে' ও নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন[৫৬]।

'শনিবারের চিঠি'র লেখকেরা অবশ্য কেউই স্বনামে লিখতেন না — অন্ততঃ গোড়ার দিকে । তাঁদের যুক্তি ছিল — "নাম অবান্তর, বক্তব্যই আসল কথা । আর সে বক্তব্য সকলকার — ব্যক্তি বিশেষের নয় ।"৫৭ কিন্তু এই 'কলেক্টিভ্ রেস্পন্সিবিলিটি' ছাড়াও বেনামে বা ছদ্মনামে লেখার অন্য কারণও ছিল । প্রখ্যাত, প্রবীণ বা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লেখকরা প্রকাশ্যে হয়ত এই হাল্কা ও সস্তা রসিকতার সঙ্গে একাত্ম দেখাতে চাইতেন না, বা বিতর্কের কেন্দ্র হতে অনিচ্ছুক ছিলেন । নিছক রঙ্গপ্রিয়তাও অনেকের কাছে এই সকল ছদ্মনামের কারণ রূপে হয়ত ছিল । একই ব্যক্তির একাধিক লেখাকে গোপন করাও বেনামী রচনায় সহজেই সম্পন্ন করা যায় । কিছু কিছু ছদ্মনামে লেখকের উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট হয়েও উঠেছে। সেখানে তাঁরা যে একটা উদ্দেশ্য বা আদর্শের বাহক, ছদ্মনামের মাধ্যমে সেকথাটা যেন বোঝাতে চেয়েছেন । কোথাও কোথাও আক্রমণের ভঙ্গিরূপেও ছদ্মনাম ব্যবহৃত হয়েছে।- সেখানে বিপক্ষীয় লেখকের নাম, বা তাঁর লেখার শিরোনাম বা বক্তব্যকে ভেঙচানোর প্রয়াস বেশ স্পষ্ট । সচেতন উদ্দেশ্য, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ- উপহাস- পরিহাস বা নিছক মজা করার উদ্দেশ্যেই অনেক ছদ্মনাম ব্যবহৃত । আর কোন কোন ছদ্মনাম তো লেখকের প্রকৃত নামকে গোপন করেই সাহিত্যে ও পাঠক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । আসলে 'শনিবারের চিঠি'র লেখক বা তাঁদের আড্ডার কথাই শুধু নয়, তাঁদের ব্যবহৃত ছদ্মনামের তালিকা ও সনাক্তিকরণের মধ্যে পত্রিকাটির বিশিষ্ট ধর্মটি ফুটে উঠেছে । (পরিশিষ্ট অংশে 'শনিবারের চিঠি'র লেখক ও তাঁদের ছদ্মনাম ব্যবহারের তালিকা দেওয়া হবে)

গ্রন্থসূত্র

১. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা দেশের ইতিহাস — ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ- ৪১০

২. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস — ৪র্থ খণ্ড,পৃ·৩২০, ১৯৬৩

৩. — -ঐ- -ঐ- পৃঃ- ২৪৭-৬০

৪. শ্রী অচিন্ত্য সেনগুপ্ত : কল্লোল-যুগ — পৃঃ- ৮২, ২০৬, ৩৭০, সং ১৩৬০

৫. শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : শনিবারের চিঠি —'সজনীকান্ত', ফাল্গুন, ১৩৬৮

৬. শ্রী বুদ্ধদেব বসুর চিঠি —'কল্লোল যুগ'-এ উৎকলিত, পৃঃ- ২৫০

৭. শ্রী বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্য পত্র — স্বদেশ ও সংস্কৃতি, পৃঃ- ৪০

৮. ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় : কল্লোলের কাল — পৃঃ- ৪৩, ১৩৩, ১৫৯

৯. ডঃ গোপিকানাথ রায় চৌধুরী : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য — পৃঃ- ২২৫, ২২৭

১০. ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : শনিবারের চিঠি — সুমিত্র সজনীকান্ত, ফাল্গুন, ১৩৬৮

১১. শ্রী হুমায়ুন কবীর : -ঐ- -ঐ- -ঐ-

১২. ডঃ রথীন্দ্র নাথ রায় : শনিবারের চিঠি — একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, ফাল্গুন, ১৩৬৮

১৩. শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : -ঐ- সজনীকান্ত , ফাল্গুন, ১৩৬৮

১৪. শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল : বনস্পতির বৈঠকে — ১ম খণ্ড, পৃঃ- ৪৪৮

১৫. শ্রী কালিদাস রায় : শনিবারের চিঠি — স্মৃতিকথা , ফাল্গুন, ১৩৬৮

১৬. শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক : -ঐ- — সজনীকান্ত, -ঐ-

১৭. শ্রী সুশীল রায় : -ঐ- -ঐ- -ঐ-

১৮. শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় -ঐ- যেটুকু জেনেছি -ঐ-

১৯. প্রবাসী পত্রিকা — জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫, পৃঃ- ২২৭

২০. শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, পৃঃ- ৩৪

২১. ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় : কল্লোলের কাল , পৃঃ- নিবেদন

২২. শ্রী সজনীকান্ত দাস : আত্মস্মৃতি (অখণ্ড), পৃঃ- ১০২

২৩. শ্রী সজনীকান্ত দাস : শনিবারের চিঠি — নিবেদন, পৌষ, ১৩৩১

২৪. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস —৪র্থ খণ্ড, পৃঃ- ২৫৭, সং ১৯৬৩

২৫. ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় : কল্লোলের কাল , পৃঃ- ৪৩

২৬. শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় : শনিবারের চিঠি — সজনীকান্ত স্মরণে, ফাল্গুন, ১৩৬৮

২৭. শ্রী সজনীকান্ত দাস : আত্মস্মৃতি (অখণ্ড), পৃঃ- ১১০

২৮. - -ঐ- পৃঃ- ১১৯, ১২৪, ১৩৬

২৯. - -ঐ- পৃঃ- ১৭০

৩০. শ্রী সজনীকান্ত দাস : শনিবারের চিঠি — নিবেদন, পৌষ, ১৩৩১

৩১. - আত্মস্মৃতি (অখণ্ড) পৃঃ- ১২৬-২৮

৩২. - -ঐ- পৃঃ- ১৭০

৩৩. - -ঐ- পৃঃ- ১৮৫

৩৪. - -ঐ- পৃঃ- ২১৫

৩৫. - -ঐ- পৃঃ- ১৮৮

৩৬. - -ঐ- পৃঃ- ২৮২-৮৩

৩৭. - -ঐ- পৃঃ- ৩৪৫

৩৮. - -ঐ- পৃঃ- ৩৬৭

৩৯. - -ঐ- পৃঃ- ৩৭২

৪০. শ্রী পরিমল গোস্বামী : যখন সম্পাদক ছিলাম, পৃঃ- ৫-১২

৪১. শ্রী সজনীকান্ত দাস : আত্মস্মৃতি (অখণ্ড) , পৃঃ- ৩৮৬

৪২. শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সজনীকান্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী —শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন, ১৩৬৮

৪৩. শ্রী সজনীকান্ত দাস : আত্মস্মৃতি (অখণ্ড), পৃঃ- ৪১৯-২০

৪৪. - -ঐ- পৃঃ- ২৫৩-৫৪

৪৫. ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় : কল্লোলের কাল, পৃঃ- ৮৯

৪৬. শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল : বনস্পতির বৈঠকে (১ম), পৃঃ- ২৬৫

৪৭. শ্রী সজনীকান্ত দাস : আত্মস্মৃতি (অখণ্ড), পৃঃ- ১৩২-৩৩

৪৮. - -ঐ- পৃঃ- ২৭৯

৪৯. - -ঐ- পৃঃ- ১১২

৫০. - -ঐ- পৃঃ- ২৫৪

৫১. শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্যজীবন, পৃঃ- ৫৫-৫৬

৫২. শনিবারের চিঠি : পুরাতনী, আশ্বিন, ১৩৫৭

৫৩. শ্রী পরিমল গোস্বামী, শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,

ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায়, শ্রী সজনীকান্ত দাস, শ্রী গোপাল হালদার প্রভৃতির গ্রন্থগুলি থেকে এই তালিকাটি প্রস্তুত। এ ছাড়াও আরও অন্য লেখকের নাম এই সব গ্রন্থে দেখা যায় – যা পুরোপুরি গ্রহণ করলে অতিদীর্ঘ তালিকা হয়ে যাবার ভয়ে মোটামুটি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৪. শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য জীবন, পৃঃ- ৫৫-৫৬

৫৫. শ্রী যোগানন্দ দাস : 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠি', প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৬১

৫৬. শ্রী যোগানন্দ দাস : 'শনিবারের চিঠি, মোহিতলাল, নজরুল ও সজনীকান্ত', রবিবারের যুগান্তর, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৬১

৫৭. শ্রী গোপাল হালদার : শনিবারের চিঠি, সজনী স্মরণে, ফাল্গুন, ১৩৬৮